মাসুদ রানা

বিষকন্যা-২

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

বিষকন্যা-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

যত্ন আর খাতিরের বহর দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলো মাসুদ রানা। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স-এর একটা মার্সিডিজ গাড়ি বাংলাদেশ কনসুলেট থেকে পরদিন বিকেলে তুলে নিলো ওকে, পৌঁছে দিলো পোর্ট সাঈদ এয়ারপোর্টে। ওখানে ওকে বিদায় জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। কাস্টমসের ঝামেলা পোহাতে হলো না, পথ দেখিয়ে অফিসার ওকে একটা মিশরীয় প্লেনে তুলে দিলেন। উদ্ধার পাবার পর পোর্ট সাঈদে ফিরে কিছুক্ষণ ইন্টেলিজেন্স অফিসে বসতে হয়েছিল রানাকে, তখন গোসল ও খাওয়াদাওয়া করার আমন্ত্রণ জানানো হয়, তার আগে নতুন একটা সুট উপহার দেয়া হয় ওকে। সেই স্যুটটাই এখনো পরে আছে রানা।

রোডসে পৌঁছেও প্রায় ভি.আই.পি. অভ্যর্থনা পেলো রানা। একজন গ্রাউণ্ড ক্রুম্যান পতাকা নেড়ে ওর প্লেনটাকে পথ দেখালো, পার্কিং অ্যাপ্রনে থামলো জেট। প্লেনটায় রানা একাই আরোহী, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দেখলো অদূরে একটা মার্সিডিজ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

মার্সিডিজে উঠে বসার আগে জানালা দিয়ে ভেতরে তাকালো রানা। প্রিয় একটা মুখ দেখতে পেয়ে বুকের রক্ত নেচে উঠলো ওর। এখানেও কাস্টমসের কোনো ঝামেলা পোহাতে হলো না। গ্রীক ইন্টেলিজেন্স-এর দু'জন অফিসার মার্সিডিজ থেকে নেমে করমর্দন করলো রানার সাথে, শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলো। রানাকে নিয়ে ওর প্রিয় বন্ধু ছেড়ে দিলো গাড়ি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে রোডস টাউনের দিকে তীর বেগে ছুটলো মার্সিডিজ।

খানিকক্ষণ কোনো কথা হলো না। গাড়িতে দু'জন মাত্র মানুষ, ড্রাইভারের পাশে রানা। দু'জনেই নাক বরাবর সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, পরস্পরের উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সচেতন নয়।

তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানা, 'মারবো শালা এক লাথ্! সাধু বাবাজির ভেক ধরে মৌনব্রত পালন করছিস, মতলবটা কি?'

সাথে সাথে কিছু বললো না সোহেল আহমেদ। খানিক পর খেদ প্রকাশ পেলো তার গলায়, 'দুনিয়াটার যে কী হলো! কৃতজ্ঞ মানুষ আজকাল আর দেখা যায় না।' তারপর অকস্মাৎ রানার পাঁজরে কনুই দিয়ে মস্ত এক গুঁতো মারলো সে। 'শালা, নরক থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দান করলাম, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত পাবো না?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো রানা। 'এই নে, প্রতিদান। মনে থাকে যেন, শোধবোধ হয়ে গেল। তোর কাছে আমার আর কোনো ঋণ নেই।'

'প্রাণ বাঁচালাম, তার বিনিময়ে এক প্যাকেট সিগারেট?' হাঁ হয়ে গেল সোহেল।

ঠোঁটে সদয় হাসি নিয়ে মাথা নাড়লো রানা। 'এক প্যাকেট

নয়, একটা,' ভুলটা ধরিয়ে দিলো ও।

বোবা বনে গেল সোহেল। তারপর বিস্ফোরণ ঘটলো গাড়ির ভেতর, 'কি বললি?'

'মুখ বন্ধ কর, আলাজিভ দেখা যাচ্ছে,' শান্ত সুরে বললো রানা।

রানার শান্ত ভাবটাই গায়ে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো সোহেলের, অকস্মাৎ ব্রেক কষে গাড়ি থামালো সে, মারমুখো ভঙ্গিতে বললো, 'তোকে আমি কোথাও পৌঁছে দিতে পারবো না, শালা, নেমে যা গাড়ি থেকে।'

আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালো রানা, সোহেলের কথা যেন শুনতেই পায়নি। তারপর নরম সুরে বললো, 'আহা, মাথা গরম করছিস কেন? হিসেবটা ধরিয়ে দিলেই তো হলো!'

'হিসেব? কিসের হিসেব?'

'আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে একটার বেশি সিগারেট তোর পাওনা হয় না।'

'মানে?'

'আচ্ছা, ধর, তুই কাউকে আমার ব্যাপারে সুপারিশ করিসনি। ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্সও আমাকে খুঁজে পায়নি,' বললো রানা। 'হিংস্র জনতার হাতে আমি মারা গেছি। যথাসময়ে খবরটা পেলি তুই। তারপর?'

'তারপর কি?'

'মারা গেছি, কাজেই আমার আর কোনো ব্যাপার নেই,' বললো রানা। 'কিন্তু তোর ব্যাপারটা কি হবে? কাজে মন বসাতে পারবি? ভুলে যেতে পারবি আমাকে? তোর আত্মহত্যা করার ইচ্ছে

হবে না? কিংবা প্রতিশোধ নেয়ার? খেতে বসেছিস, আমার প্রিয় খাবারগুলো দেখলে তোর আর খাওয়ার রুচি থাকবে? আমার কোনো বান্ধবীর সাথে দেখা হলে তোর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠবে না? বুকে হাত রেখে বলতে পারিস, আমি মারা গেলে তোর দিনগুলো সুখে-শান্তিতে কাটবে?' হেসে উঠলো রানা, সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো সোহেলের দিকে। 'কাজেই, আমার জন্যে নয়, যা কিছু করেছিস সবই নিজের স্বার্থে। হিসেবটায় যদি কোনো ভুল থাকে তো বল, শুধরে নেবো।'

রানা থামার আগেই গাড়ি আবার ছেড়ে দিয়েছে সোহেল, চোখ দুটো যাতে রানা দেখতে না পায় সেজন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে সে।

হাসতে হাসতে রানা বললো, 'সত্যি কথা বলতে কি, সিগারেটটা তোকে আমি এমনি অফার করেছি, প্রতিদান হিসেবে নয়। নিজের উপকার করেছিস, তার আবার প্রতিদান কি?'

'ঠিক আছে,' বলে প্যাকেটটা রানার হাত থেকে তুলে নিলো সোহেল, ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা তাড়াতাড়ি পকেটে ভরে রাখলো।

হৈ-চৈ জুড়ে দিলো রানা, 'কি ব্যাপার? কি করছিস?'

'নিজের উপকার,' নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো সোহেল। 'অভ্যেস হয়ে গেছে কিনা।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সশব্দে হেসে উঠলো দু'জন।

হাসি থামতে রানা জানতে চাইলো, 'কাজের কথা হোক। ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের কাকে ধরেছিলি বলতো?'

'ওদের কাউকে না,' জানালো সোহেল। 'রাষ্ট্রপ্রধানকে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে।'

'মাই গড! তাইতো বলি! একেবারে যাদুর মতো কাজ হয়েছে, বুঝলি! আমাকে ওরা জামাই আদর করেছে। আর গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারটা? ওরা নিশ্চয়ই পুলিশকে বোঝাতে পেরেছে, আমি নির্দোষ?'

মাথা নাড়লো সোহেল। 'গ্রীক ইন্টেলিজেন্স অনুরোধ করায় পুলিশ তোকে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় বরাদ্দ করেছে মাত্র। এর মধ্যে তোকে প্রমাণ করতে হবে কোস্টাস অ্যারোনাফিসের ভিলায় যা ঘটেছে তার জন্যে তুই দায়ী নোস। এখনো তোকে ওরা সন্দেহের তালিকায় সবার ওপরে রেখেছে, রানা।'

'কিন্তু তুই কি জানিস, কোস্টাস অ্যারোনাফিস বেঁচে আছে? মিশরে রওনা হবার আগে এয়ারপোর্টে দেখেছি তাকে আমি।'

'জানতাম বেঁচে আছে সে। কিন্তু তার ভিলায় মারা গেছে দু'জন লোক।

অফ দ্য রেকর্ড, গ্রীক ইন্টেলিজেন্সে আমাদের বন্ধুরা বিশ্বাস করতে চায়, ঘটনাটার সাথে তোর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তদন্তে ঢিলেঢালা ভাব দেখানোর ঝুঁকি তারা নিতে পারে না। খবরের কাগজে যদি ছাপা হয় যে বাংলাদেশের একজন স্পাই ঘটনার সাথে জড়িত ছিলো জানা সত্ত্বেও তারা তাকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'আটচল্লিশ ঘন্টা তো? দেখা যাক...।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সোহেল বললো, 'তার বেশি অপেক্ষা করতে পারবে না ওরা। তবে সমস্যা হবার কথা নয়, কারণ তার অনেক আগেই গ্রীস ছেড়ে চলে যাবি তুই। কিন্তু যদি না যাস, ওরা তোকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করতে বাধ্য হবে। ডিটেনশনে পাঠাতে

পারে, তারমানে অনির্দিষ্টকাল আটকাদেশ দিতে পারে কোর্ট। সেক্ষেত্রে আমরা তোকে কোনো রকম সাহায্যই করতে পারবো না। কথাটা মনে রেখে যা কিছু করার করতে হবে তোকে।'

সীটে হেলান দিলো রানা, একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো চেহারা। জানালার বাইরে সূর্যদেবতা হেলিয়স-এর প্রিয় দ্বীপ নীল আকাশের নিচে রোদে ঝলমল করছে। মন্টি স্মিথ রোডস টাউনের পুব সীমায় মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে, কয়েক কিলোমিটার সামনে। ওই পাহাড়ের চূড়া থেকে স্মিথ নামে একজন ইংরেজ স্পাই নেপোলিয়নের জাহাজ বহরের ওপর নজর রেখেছিল।

চোখ ফিরিয়ে রানাকে লক্ষ করলো সোহেল, 'প্রায় পৌঁছে গেছি,' বললো ও।

'নিকোলাই প্যাসিমভ কি এখানে আছেন?'

'না থাকার কি কারণ?'

রানা কিছু বললো না। সুয়েজ ক্যানেলে যা ঘটেছে, সবই প্রায় জানা আছে সোহেলের। কনসুলেটে রানার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিল সে। সত্যিই তো, রুশ বিজ্ঞানীর রোডসে না থাকার কোনো কারণ নেই। রুশ ভিন্ন মতাবলম্বীকে ডাচ জর্জ সরাসরি এখানে নিয়ে আসবে, তাঁকে এইচআরসি-র হেফাজতে রাখা হবে, এটাই তো যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, কর্নেল রুস্তমভের সাথে ওর দ্বন্দ্বের কথা মনে রেখে, সামান্যই স্বস্তিবোধ করলো রানা। গ্রীক কোটিপতি প্রসঙ্গে ফিরে এলো ও। 'তুই বললি, তোরা জানতিস কোস্টাস অ্যারোনাফিস বেঁচে আছে?'

'আমরা সন্দেহ করেছিলাম ব্যাপারটা। ভিলায় যে লাশগুলো পাওয়া গেছে, দু'জনকেই সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।'

'দ্বিতীয় লাশটা কার?'

‘একজন মার্কিন নাবিক, এডওয়ার্ড গ্রীন।’

‘এই একই এডওয়ার্ড গ্রীন কি হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস-এর হয়েও কাজ করে?’ অবাক হয়ে জানতে চাইলো রানা। ‘সে-ই কি নিকোলাই প্যাসিমভকে নেমিসিসে তুলেছিল?’

‘ঠিক তাই। তোর কোনো ধারণা আছে, রোডসে এলো কি করে লোকটা? এখানে কি করছিল সে?’

মাথা নাড়লো রানা। ‘না।’ এক মুহূর্ত পর বললো, ‘এ-ব্যাপারে এইচআরসি কর্মকর্তাদের কি বলার আছে?’

‘প্রথমে তারা গ্রীনকে সি. আই. এ.-র লোক বলে মানতে চায়নি। গ্রীনের ডোশিয়ে দেখবার পর বলছে, সি. আই. এ. রোপণ করেছিল তাকে, তাদের অজ্ঞাতে।’

‘হুম। তাদের অজ্ঞাতে এরকম আরো কতো চর ওখানে লুকিয়ে আছে কে জানে।’

‘তোর এই কোস্টাস অ্যারোনাফিস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি,’ নামটা উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাব কঠোর হয়ে উঠলো সোহেলের। ‘সে-ই নেমিসিসের মালিক, জানিস তো?’

‘হ্যাঁ, চন্দন আমাকে বলেছে।’

‘আরো আছে। লোকটা আর্মস স্মাগলার, বিপুল টাকার মালিক হওয়ার পিছনে সেটাই আসল রহস্য। লেবাননের গৃহযুদ্ধকে পুঁজি করে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছে।’

ছোট্ট খাঁড়িটার কথা মনে পড়লো রানার, অ্যারোনাফিস ভিলার সরাসরি নিচে, পাথুরে প্রাচীর তিন দিক থেকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে। ‘তার ইয়টটা যেখানে রাখা হয়,’ বললো রানা, ‘জায়গাটা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রকৃতির একটা দান, স্মাগলিঙের

কাজে লাগাচ্ছে অ্যারোনাফিস।'

'আফ্রিকার অনেক দেশের সাথে অস্ত্রের অবৈধ ব্যবসা করছে লোকটা। শুধু আর্মসই হয়তো নয়, চোরাই শিল্পকর্ম বা ড্রাগসের ব্যবসাও করে বলে সন্দেহ করছি। ভালোভাবে তার অতীত জানতে হলে আরো সময় দরকার।'

'সন্তুষ্ট করার মতো কিছু বলছিস না।'

'লোকটা আসলে সুযোগসন্ধানী, তার মতো লোভী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। তবে, বহিরাবরণ বা ইমেজ সম্পর্কে ভারি সচেতন। যে-কোনো বিচারে সাধারণ ক্রিমিনাল তাকে বলা যাবে না।' রোডস টাউনের শহরতলীতে পৌঁছুলো গাড়ি, রাস্তার দু'পাশে ইটালিয়ান স্থাপত্যরীতির ঔৎকর্ষ নিয়ে সারি সারি দালান-কোঠা, প্রতিটি বাড়ির সামনে সুদৃশ্য বাগান। সেদিকে না তাকিয়ে বলে চলেছে সোহেল, 'নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে, তবে মায়ের তরফ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যোগাযোগ ছিলো, যদিও তার বাবা সেগুলো ব্যবহার করতে শেখেনি। লেখাপড়ায় ভালো ছিলো কোস্টাস অ্যারোনাফিস। গ্রীক ফরেন সার্ভিসে ভালো একটা পদ পেতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি। ওখানে থাকতেই অসৎ কিন্তু ক্ষমতাবান কিছু লোকের সাথে পরিচয় হয়। লেবাননে সিভিল ওঅর তুঙ্গে উঠলো, সে-ও ইন্ধন যোগাবার সুযোগ পেয়ে গেল।

'তারও আগে টন টন অস্ত্র গোপনে পাচার করার কৃতিত্ব দেখিয়ে সম্ভাব্য ক্রেতাদের মনে আস্থার ভাব এনেছে সে। ইউরোপের প্রায় সব দেশ থেকে অস্ত্র কিনতো, সীল করা ওয়্যারহাউসে তোলা হতো সে-সব, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের ঘুষ দেয়ার ফলে সরকারী সংস্থা থেকে ইন্সপেকশনের জন্যে কাউকে পাঠানো

হতো না। প্রায় রাতারাতি মিলিওনেয়ার বনে যায় অ্যারোনাফিস। এই টাকা দিয়ে আরো প্রভাবশালী লোকদের পকেটে ভরে সে, ভূমধ্যসাগরীয় অন্তত ছ'টা দেশের প্রোটেকশন কিনে ফেলে। একই সাথে আইনসম্মত ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করে সে। জাহাজ কেনে, এমনকি ত্রিপলিতে একটা শিপইয়ার্ডও। কোথায় যেন তার একটা রিফাইনারিও আছে। তবে, এখনো লোভ তার মেটেনি। মোটা লাভ দেখলে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না।'

পুরনো শহরের গম্ভীরদর্শন পাঁচিল পেরিয়ে সরু রাস্তায় বেরিয়ে এলো মার্সিডিজ। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে সোহেল, চারপাশে গিজগিজ করছে ট্যুরিস্ট। রানার হোটেলের পাশে থামলো সে।

'মনে হচ্ছে কে.জি.বি. পাহারা বসিয়েছে এখানে,' হোটেলের লবিতে ঢুকেই বিড়বিড় করলো রানা।

লবি এলিভেটরের দিকে এগোলো ওরা, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো সোহেল। ফিসফিস করে বললো, 'হ্যাঁ, আমিও ডেস্ক ক্লার্ককে মাথা দোলাতে দেখলাম। অবাক হওয়ার কিছু নেই, ওদের টিম-ওঅর্ক অত্যন্ত ভালো।'

বিশাল একটা ফুলদানিতে একগাদা গোলাপ রাখা হয়েছে, এলিভেটরের বোতামটা তার ওপরে। সেটায় চাপ দিয়ে অপেক্ষা করার সময় চট করে লবির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রানা। মেঝেতে ইসলামী সূচীশিল্পশোভিত কার্পেট, দেয়ালে মধ্যযুগীয় লণ্ঠন। ডেস্ক ক্লার্কের সূক্ষ্ম সংকেত গ্রহণকারী ব্যক্তিটিকে নিবিষ্টচিত্তে খবরের কাগজ পড়তে দেখলো ও।

একজন ব্যবসায়ী বা ট্যুরিস্টের কাপড় পরে থাকলেই যেন স্বাভাবিক হতো, কিন্তু ডেনিম পরা লোকটাকে ভারতীয় নাবিকদের মতো লাগলো রানার। লম্বা-চওড়া চেহারা, পেশীবহুল শরীর, শক্ত

চোয়াল। সরাসরি রানার দিকে নয়, চোখ তুলে সিলিঙের দিকে একবার তাকালো সে। রানা দেখলো, গোলাকার মুখে চোখ দুটো তার কালো। কালো কোঁকড়ানো চুল। কে.জি.বি. বিভিন্ন দেশের লোকদের চর হিসেবে কাজে লাগায়, জানে রানা। মিশরে যাদের দেখেছে, তাদের মধ্যে লোকটা অবশ্য ছিলো না।

কে.জি.বি-র উপস্থিতি দু'রকম অনুভূতি এনে দিলো রানার মনে। ওদেরকে অপেক্ষা করতে দেখে উদ্বেগ বোধ করলো ও, কর্নেল রুস্তমভকে সন্তুষ্ট দেখার পর এখানে ওদের উপস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে তো সমস্ত সংকট ওদের কাটিয়ে ওঠার কথা।

আরেকটা কথা ভাবলো রানা, মাঠ ছেড়ে ওরা সরে না যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, নিকোলাই প্যাসিমভ এখনো ওদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছেন। সেদিক থেকে ব্যাপারটা স্বস্তিকর।

আড়িপাতা যন্ত্রের সন্ধানে প্রথমবারই স্যুইটটায় তল্লাশী চালিয়েছে রানা, আজও একবার চালালো। পাথুরে মূর্তির মতো অপেক্ষা করছে সোহেল। অসহিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ নেই চেহারায়। আসবাব-পত্রের কোনোটাই নাড়াচাড়া করা হয়নি, তবে একজোড়া খুদে ট্র্যান্সমিটার পেলো রানা। একটা টেলিফোনে, অপরটা বাতির একটা সুইচে। হাতের তালুতে নিয়ে সোহেলকে দেখালো ও। ঠাণ্ডা চোখে দেখলো সোহেল, কোনো মন্তব্য করলো না। জুতো দিয়ে চ্যাপ্টা করে টয়লেটে ফেলে দিলো রানা ওগুলো।

'আমার সাথে উঠে এলি যে তুই?' সোহেলকে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কি ব্যাপার বল তো?'

'আগেই ব্যাখ্যা করা উচিত ছিলো,' বললো সোহেল। 'একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমাদের।'

‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে? কার সাথে?’

‘হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারের সাথে।’

‘আচ্ছা।’ সুটকেসটা বিছানায় ফেলে খুললো রানা। ‘তার সাথে কথা হয়েছে তোর?’

‘না। তুই ল্যাণ্ড করার খানিক আগে এথেন্স থেকে পৌঁছুই আমি,’ বললো সোহেল। ‘এখানে তিনি তাঁর ইয়টে আছেন। আমার বিশ্বাস, ডাচ জর্জ আর নিকোলাই প্যাসিমভকে সাথে করে এনেছেন তিনি।’

কাপড় পাল্টাচ্ছে রানা। ‘তা যদি হয়, তোর মনে হয় না, আমার কাজ শেষ হয়েছে এখানে?’

মাথা নাড়লো সোহেল। ‘রোডস আইল্যাণ্ড থেকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিতে হবে নিকোলাই প্যাসিমভকে,’ বললো সে। ‘যতোক্ষণ তাঁর বিপদ না কাটে, তোর কাজ শেষ হবে না।’

‘রোডস আইল্যাণ্ড থেকে তাঁকে সরানো, নিরাপদে সরানো অত্যন্ত কঠিন হবে,’ গম্ভীর সুরে বললো রানা।

‘সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে,’ বললো সোহেল । ‘এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমাদের সাথে পুলিশ থাকবে। একটা চার্টার করা প্লেনে তোলা হবে ভদ্রলোককে।’ হাতঘড়ি দেখলো সে। ‘দেড় ঘন্টা সময় আছে। সুইডেনে পৌঁছে তাঁকে তুলে দেয়া হবে ঢাকা ফ্লাইটে। ওখানে রুশ দূতাবাস আর আমাদের লোক অপেক্ষা করবে, সাংবাদিকদের নিয়ে। তুই তাঁর সাথে পুরোটা পথ থাকছিস।’

‘কিন্তু তিনি যদি বাংলাদেশে যেতে রাজি না হন?’ জিজ্ঞেস

করলো রানা।

‘বোঝাতে হবে। নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে তাঁকে।’

‘কর্নেল রুস্তমভের মতো তাঁরও যদি ধারণা হয়, আমরা আমেরিকানদের পক্ষে কাজ করছি? তিনি যদি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে না পারেন? তিনি যদি জেদ ধরেন, গোঁয়ার্তুমি করেন, আমরা তাঁর কথায় কান দেবো না,’ গম্ভীর সুরে বললো সোহেল। ‘নিজেদের কাছে আমরা পরিষ্কার, তাকে পুঁজি করে বাংলাদেশ কোনো স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে না। ভালো কথা, ঢাকায় পৌঁছে দিন কয়েকের জন্যে গায়েব হয়ে যাবি তুই। বসকে বলে আগেই তোর ছুটি মঞ্জুর করিয়ে রেখেছি।’

‘তুই ভয় পাচ্ছিস, রুস্তমভ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ঢাকা পর্যন্ত হাত বাড়াবে?’

‘ভয় পাচ্ছি না, আমি জানি।’

‘ইথিওপিয়ায় যাবার কি হবে?’ জানতে চাইলো রানা। ‘ওখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এই সময় জলপরী মেমোর সাথে জড়িয়ে ফেলা হলো আমাকে।’

‘ওখানকার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।’

গাঢ় সবুজ টাইয়ের নটটা ঠিকঠাক করলো রানা, বগলের তলায় হোলস্টারটা অ্যাডজাস্ট করলো। পোর্ট সাঈদ থেকে একটা .৩৮ স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন সংগ্রহ করেছে ও। ব্রাউন জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে সোহেলের দিকে তাকালো ও।

‘কি হলো, কি ভাবছিস?’

আরো এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রানা বললো, ‘আফ্রিকার কথা বললি তুই। ক্যানেল দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলো নেমিসিস। সন্দেহ নেই, রাশিয়ানরা জাহাজটা দখল করে নেয়ার আগে। খালি

হোল্ড নিয়ে আফ্রিকার দিকে যাচ্ছিলো কেন?’

‘ডাইভারশন, তোর ধারণা? কি উদ্দেশ্যে?’ সোহেলের প্রশ্নের মধ্যে অসহিষ্ণু একটা ভাব রয়েছে। হাতঘড়ি দেখলো সে। নেমিসিস সম্পর্কে তেমন কোনো আগ্রহ নেই বলে মনে হলো। রুশ বিজ্ঞানীকে পাওয়া গেছে ধরে নেয়ার পর আগ্রহ থাকার কথাও নয়।

‘জাহাজটা খালি ছিলো কেন, আমি জানি না,’ নিচু গলায়, যেন নিজের সাথে কথা বলছে রানা। ‘তবে আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে রাশিয়া থেকে ওটা রওনা হয়েছিল ইয়েলোকেক কার্গো নিয়ে।’

‘ইউরেনিয়াম অক্সাইড?’ চোখ বড় করলো সোহেল, তীক্ষ্ণ চোখে রানার মুখভাব লক্ষ করলো। ‘বলিস কি!’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা। ‘জেনেই বলছি আমি।’

‘জিনিসটাকে পরিশোধিত করার পর উইপনস-গ্রেড ইউরেনিয়ামে পরিণত করা যায়!’

‘জানি। নেমিসিসের ডেকে হলদেটে দাগ দেখেছি আমি, ফরওয়ার্ড হ্যাচ কাভারের পাশে। অ্যারোনাফিসের ভিলার কাছে, উপকূল থেকে সামান্য দূরে, একটা ব্যারেলেও ওই জিনিস দেখেছি। আমার ধারণা, এখানেই নামানো হয় কার্গো, সম্ভবত অন্য কোনো জাহাজে তোলা হয়েছে। কাজটা করার সময় একটা ব্যারেল পানিতে পড়ে যায়।’

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো সোহেল, তারপর বললো, ‘মনে হচ্ছে ইউরেনিয়াম শিপমেন্ট নিয়ে কিছু কৌশল করেছে অ্যারোনাফিস, তার আয়োজনের কারণেই মনে হচ্ছিলো নিকোলাই প্যাসিমভ হারিয়ে গেছেন।’

‘কৌশলটা হাইজ্যাকিংও হতে পারে।’

‘তার নিজের জাহাজ?’

‘নিজের জাহাজ বলেই তো কাজটা সহজ হয়েছে। তবে কার্গোটা নিজের নয় তার। কেউ নিশ্চয়ই আগেই মূল্য পরিশোধ করেছে, তা না হলে জিনিসটা লোড করা হতো না।’

সোহেল চিন্তিত হলো। ‘প্রসেস করা এক জাহাজ ইউরেনিয়াম ওর–এর দাম হবে, কম করেও, একশো মিলিয়ন ডলার, ব্ল্যাকমার্কেটে...।’

‘আসল বিপদটা অন্যখানে,’ বললো রানা। ‘কি কাজে ব্যবহার করা হবে তার ওপর নির্ভর করে।’

‘ওই ইউরেনিয়াম অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে, রানা,’ দৃঢ়কণ্ঠে বললো সোহেল। ‘কোস্টাস অ্যারোনাফিসের মতো লোক দুনিয়াটাকে ধ্বংস করার উপকরণ অপাত্রে দান করতে পারে, তার দ্বারা কাজটা সম্ভব। ইসরায়েল বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কোনও দেশ যদি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়, দুনিয়ার মানুষের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।’

দুই

টাকার লোভে সভ্যতার সমস্ত বাঁধন অগ্রাহ্য করে অতিরিক্ত বেড়ে উঠেছে কোস্টাস অ্যারোনাফিস। ব্যক্তিস্বার্থ অন্ধ করে দিয়েছে তাকে, মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ তার বিবেচ্য বিষয় নয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্ষমতালোভী কোনো একনায়ক যদি অ্যারোনাফিসের কাছ থেকে পাওয়া ইউরেনিয়াম অক্সাইড পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

'দ্বীপ ছেড়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে আমাকে,' বললো সোহেল। 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিকে সতর্ক করা দরকার।'

'কিন্তু সবাইকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না,' বললো রানা। 'সবাই যদি জানতে পারে ব্যাপারটা, ইউরেনিয়াম হাত করার জন্যে দুনিয়া জুড়ে একটা উন্মত্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে।'

'বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছিস। খুনোখুনি কাণ্ড বেধে যাবে।'

'আটচল্লিশ ঘন্টা না পেরুনো পর্যন্ত এখানেই থাকতে চাই

আমি,' বললো রানা। 'ইউরেনিয়াম রহস্যের চাবি হয়তো এখানেই কোথাও আমাদের নাকের ডগায় রয়েছে।'

একটা ভুরু উঁচু করে তাকালো সোহেল। 'অ্যারোনাফিস?'

'ঘটনাটা শুরু হয়েছে এখান থেকে, তাই না? আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, শেষও হবে এখানে।'

'কোথায় আছে সে, তোর কোনো ধারণা আছে?'

মাথা নাড়লো রানা। 'রোডসে থাকলে আমি আশ্চর্য হবো না।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে সোহেল বললো, 'যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবি তুই, প্রয়োজনে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্টটা এরকম বিপজ্জনক মোড় নিতে পারে বলে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন বস্, সেজন্যেই তোকে জেড ক্লিয়ার্যান্স দিতে বলেছিলেন।'

নিঃশব্দে হেসে মাথা ঝাঁকালো রানা, তারপর বললো, 'তথ্য বা আভাস পাবার কতো বিচিত্র উৎসই না আছে বুড়োর।'

'এবার তাহলে বেরুতে হয় আমাদের,' বললো সোহেল। 'অ্যাপয়েন্টমেন্টটা অত্যন্ত জরুরী।'

ডেনিম পরা লোকটা এখনো রয়েছে লবিতে। অলস পায়ে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এলো সে, মার্সিডিজটাকে পাহাড় থেকে নেমে পুরনো শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো।

নিয়া আগোরা অর্থাৎ নতুন বাজারে পৌঁছুলো মার্সিডিজ। সবুজ টালি দিয়ে ছাওয়া সার সার তোরণের নিচে দাঁড়কাকদের মিটিঙ বসেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি থেকে ওরা যেন একটা গরম তন্দুরের ভেতর বেরিয়ে এলো। বাতাস থেমে আছে, চারপাশে

ট্যুরিস্টদের ভিড়। তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে ছয় কোনা উঠানটাকে রীতিমতো জ্যান্ত বাজার বলেই মনে হলো রানার। কাফে আর স্যুভেনির শপে বিরতিহীন বেচা-কেনা চলছে। গায়ে গায়ে ঠেকে আছে ফল, তরিতরকারি, মাংস আর সীফুড উপচে পড়া স্ট্যাণ্ডগুলো। কাছাকাছি একটা মসজিদ থেকে আগরবাতির গন্ধ ভেসে আসছে। চার্চটা আগেও দেখেছে রানা, বাজারটার সাথেই ইটালিয়ান ফ্যাসিস্টরা তৈরি করেছিল। ইটালিয়ান শাসকদের জন্যে দ্বীপটাকে গ্রীষ্মকালীন অবকাশযাপন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার একটা মহাপরিকল্পনা করেছিলেন মুসোলিনী, বাজারটা সেই পরিকল্পনারই একটা অংশবিশেষ। থেমে থাকা বাতাসে ফুলের গন্ধও রয়েছে, বাজার ও বাগানের এমন সহাবস্থান আর কোথাও দেখেছে কিনা মনে করতে পারলো না রানা।

একটা রাস্তা ধরে ম্যানড্রাকি হারবারের সামনে চলে এলো ওরা। ফুটপাতে বেকার বা ভবঘুরে যুবকদের ইতস্তত পদচারণা লক্ষ করা গেল। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে এগোলো ওরা। একটা কাফের সামনে থামলো সোহেল। রানার দিকে একবার তাকিয়ে আরেক দিকে ফিরলো সে, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেন্ট জন চার্চের কাছে নোঙর করা একটা একশো ফুটি মোটর ইয়ট দেখলো রানা। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকালো ও, পিছু নেয়ার কোনো আভাস পেলো না। হোটেলের লবিতে দেখা পেশীবহুল লোকটার কথা মনে পড়ে গেল।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক হয়ে ইয়টে উঠলো ওরা। নীল জমিনের ওপর হলুদ ক্রসচিহ্ন, সুইডেনের পতাকা, হালকা বাতাসে নড়ছে। ইয়টটা ভারি সুন্দর, বোঝাই যায় ধনী কোনো লোকের শখের জিনিস।

সেগুন কাঠের তৈরি একটা আফটার ডেক পেরুলো ওরা, সাদা আর লাল টেবিল-চেয়ারগুলোকে পাশ কাটালো। ডেক আর রেইল ঝকঝক তকতক করছে। দিগন্তরেখার দিকে একবার তাকালো রানা। হারবারের প্রবেশমুখে দেখা গেল সেন্ট নিকোলাস দুর্গ, হলদেটে পাথুরে গোড়ায় আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ। চ্যানেলের দু'দিকে খাড়া হয়ে রয়েছে পাথরের স্তম্ভ, মাথায় সিম্বলস অভ রোডস, একটায় ব্রোঞ্জের তৈরি পুরুষ-হরিণ, অপরটায় স্ত্রী-হরিণ। জেটিটাও পাথরের তৈরি, শেষ মাথায় ড্রাম আকৃতির উইণ্ডমিল, মধ্যযুগের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন দুর্গ থেকে তীর পর্যন্ত প্রসারিত।

তিনি বসে আছেন কুঁজো হয়ে। কড়া ভাঁজের লাল ইউনিফর্ম পরা এক চীনা লোক ডেক সুপারস্ট্রাকচার ঘুরে বেরিয়ে এলো ওদের সামনে, পরিচয়-পত্র দেখতে চাইলো। আড়ালে রাখা মাইক্রোফোন থেকে কোমল মিউজিকের শব্দ ভেসে আসছে। এয়ার-কণ্ডিশনিং মেশিনারির মৃদু গুঞ্জন ঢুকলো কানে।

ইয়টের খোলে অনবরত আঘাত করছে ছোটো ছোটো ঢেউ।

দরজাটা গোল, ঝাপসা কাঁচ লাগানো। অ্যাটেনড্যান্টের পিছু পিছু বিশাল এক সেলুনে ঢুকলো ওরা। মেঝেতে পুরু কার্পেট, সাদার ওপর সোনালি আর নীল নক্সা। সেলুনের বাতাস হিম শীতল। মূল্যবান পোশাক পরা সম্মানী অতিথিদের দিকে তাকালো রানা। বেশ কয়েকজনকে চিনতে পারলো ও। ইটালিয়ান কাউন্ট, ফ্রেঞ্চ অভিনেতা, সুইডিশ মডেল, জার্মানীর টেনিস তারকা বেশিরভাগই ইউরোপীয়। ককটেলের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে সবাই, মৃদুকণ্ঠে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। সেলুনের দেয়ালগুলো বাঘের চামড়া দিয়ে মোড়া।

কেউ তারা ওদেরকে লক্ষ করলো না।

পথ দেখিয়ে একটা স্টাডিতে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে। চামড়া মোড়া একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছেন সোরেৎসেন বারকেইনহেইমার। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে আছে তাঁর, প্রথমেই লক্ষ করলো রানা।

সাদা লিনেনের ব্লেজার পরে আছেন ভদ্রলোক, ব্রেস্ট পকেট রঙিন হয়ে আছে লাল রুমালের কোণ বেরিয়ে থাকায়। কলারের দুই প্রান্তে মুক্তো বসানো সোনার বোতাম ঝলমল করছে। মাথায় ক্যাপ, কিনারায় বেরিয়ে থাকা ধবধবে সাদা চুলও যেন তাঁর অলংকার। কিন্তু তিনি বসে আছেন কুঁজো হয়ে।

খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, কথা বলার শক্তি নেই তাঁর।

তারপর তিনি শিরদাঁড়া খাড়া করার চেষ্টা করলেন, বললেন, 'নিকোলাই প্যাসিমভকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। মুক্তিপণ না দিলে তাঁকে ওরা ছাড়বে না।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লা…,' বসলো সোহেল, দেখে মনে হলো বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে।

'আমার লাগছে না,' তিক্তকণ্ঠে বললো রানা। পরিকল্পনায় গলদ নয়, এ যেন ওর ব্যক্তিগত পরাজয়। ওর সাথে বেঈমানী করা হয়েছে। পাল্টা আঘাত হানার জন্যে অস্থিরতা অনুভব করলো ও।

লালচে হয়ে উঠলো সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারের মুখ। 'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন, মি. রানা?'

চাবুকের মতো শব্দ বেরিয়ে এলো তাঁর গলা থেকে। নিজেকে সামলে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। অর্থ এবং ক্ষমতা, দুটোই বিপুল পরিমাণে আছে তাঁর, কারো খোঁচা হজম করার ধাত নয়।

বারকেইনহেইমারের বলার ভঙ্গি আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলো, মুঠো করা একটা হাত ডেস্কের ওপর রেখে সুইডিশ ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকলো রানা, চোখ দুটো কঠিন। 'বোঝাতে চাইছি, আপনারা একটা সংগঠন চালাচ্ছেন আনাড়ি, বাচাল আর ভাঁড়দের নিয়ে...।'

'রানা!' বাধা দিলো সোহেল।

কিন্তু থামলো না রানা। এ-ধরনের একটা অপারেশনে জড়িয়ে পড়াই উচিত হয়নি হিউম্যান রাইটস কংগ্রেসের। আপনাদের না আছে ট্রেনিং, না আছে যোগ্যতা। শুধু পাবলিসিটির লোভে... ।'

'শান্ত হোন, মি. রানা,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন বারকেইনহেইমার। 'আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, অত্যন্ত উঁচুদরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সমস্যার সমাধানে কাজ করছি আমরা...যারা...।'

'খুব ভালো কথা,' বললো রানা। 'কিন্তু আপনাদের আদর্শের বলি হয়েছে এথেন্সে আমাদের একজন এজেন্ট, কারণ আপনি বা আপনার প্রতিনিধি ডাচ জর্জ ওখানে আমাদের মিটিংটার কথা গোপন রাখতে ব্যর্থ হন। আপনাদেরই অনভিজ্ঞতার জন্যে নিকোলাই প্যাসিমভকে হারিয়েছি আমরা, এখন তাকে প্রাণ হারাতেও হতে পারে। অথচ আমরা ভাবছিলাম নিরাপদে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া যাবে।'

'যা হবার হয়েছে,' বললো সোহেল। 'এখন ভাবতে হবে...।'

তার দিকে ফিরে বারকেইনহেইমার বললেন, 'ধন্যবাদ, মি.

সোহেল।’ রানার দিকে সতর্ক চোখে তাকালেন তিনি, এখনো তাঁর দিকে ঝুঁকে রয়েছে রানা।

‘ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার,’ বললো সোহেল। ‘আসুন শুরু করি... ।’

‘ডাচ জর্জ কোথায়?’ ব্যাখ্যা চাইলো রানা। ‘কোথায় কি গোলমাল হয়েছে তার মুখ থেকে শুনতে চাই আমি।’

রানা বাধা দেয়ায় বিস্মিত হলো সোহেল।

‘মি. ডাচ জর্জ কোথায়, সে-ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন এইচআরসি কর্মকর্তা, তাকালেন সোহেলের দিকে। ‘আপনি, স্যার, বলছিলেন...।’

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবেন, বারকেইনহেইমারকে সে-সুযোগ দিতে রাজি নয় রানা। ‘কিডন্যাপাররা যখন এলো, নিকোলাই প্যাসিমভকে তখন কোথায় রেখেছিলেন আপনারা?’ কঠিন সুরে প্রশ্ন করলো ও।

বারকেইনহেইমারের দৃষ্টি ঝাড়া তিন সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকলো রানার মুখের ওপর। রানা প্রসঙ্গটা ধরে রাখতে চাইছে লক্ষ করে চুপ করে থাকলো সোহেল, জানে সঙ্গত কারণ ছাড়া জেদ ধরার মানুষ নয় ও।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বারকেইনহেইমার বললেন, যেন অবোধ একটা শিশুর সাথে কথা বলছেন তিনি, ‘আপনি বুঝতে পারছেন না? নিকোলাই প্যাসিমভকে হাতেই পাইনি আমি। নিকোলাই প্যাসিমভ বা ডাচ জর্জ, ওদের কাউকে আমি দেখিনি পর্যন্ত।’

‘জর্জ তাহলে তাকে আপনার কাছে আনেনি?’ জিজ্ঞেস করলো রানা, হঠাৎ করে যেন ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছে ও। ‘আনার ইচ্ছেও তার আসলে ছিলো না। সেজন্যেই আমাকে

বিপদে ফেলে মিশর থেকে পালায় সে। বাস্টার্ডটাকে ধরতে পারলে...।'

রানার দিকে অবাক হয়ে তাকালো সোহেল। 'কিন্তু আমি জানতাম মিশর থেকে তুইই জর্জকে বেরিয়ে আসতে বলেছিস!'

'আমাকে ফেলে পালায় সে। তার সাথে মিলি পুলটিসও। নেমিসিস থেকে পাঁচ-সাত মিনিট পর রওনা হই আমি। হাইওয়েতে ফিরে দেখি প্লেনটা নেই।'

'আমাকে সে-কথা আগে বলিসনি কেন?' জানতে চাইলো সোহেল।

'ভেবেছিলাম প্যাসিমভকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসার জন্যেই আমার জন্যে অপেক্ষা করেনি জর্জ,' বললো রানা। 'সে যে বেঈমানী করেছে সেটা এখন বুঝতে পারছি। প্যাসিমভ নিরাপদ আছেন, এতেই আমি খুশি ছিলাম। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারটাই তো আসল কথা।' মাথা নাড়লো রানা। 'জর্জ আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে। প্যাসিমভকে আটকে রেখে টাকা কামানোর ইচ্ছে তার, অথচ ওদিকে আমি আরেকটু হলে খুন হয়ে যাচ্ছিলাম!' চেহারায় ক্লান্তি, ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো ও। চেয়ারের পিছনটা ঘষা খেলো কিডনির ওপর ক্ষতটায়, ব্যথাটা নিঃশব্দে হজম করলো। রাশিয়ান লাথির কথা মনে পড়ে গেল ওর, সামনের দিকে সরে বসলো একটু।

কোমল মিউজিকের শব্দ ওর স্নায়ুতে যেন খোঁচা মারছে।

কয়েক সেকেণ্ড কেউ কোনো কথা বললো না।

তারপর বারকেইনহেইমারের দিকে তাকালো রানা। 'আপনি জানেন, ডাচ জর্জ সি.আই.এ-র লোক কিনা?'

'অসম্ভব! কি বলছেন!' তীব্র প্রতিবাদ জানালেন ভদ্রলোক।

‘কিন্তু এডওয়ার্ড গ্রীন যে সি.আই.এ-র লোক তার প্রমাণ আছে আমাদের কাছে,’ বললো রানা। ‘সে যদি হয়, জর্জের হতে বাধা কোথায়?’

‘গ্রীনকে রোপণ করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এইচআরসি-র সবাই…।’

‘বলুন জানেন না, অসম্ভব বলছেন কেন? এমন কি, আপনাকেও যদি আমরা সি.আই.এ-র লোক বলে সন্দেহ করি, আমাদের দোষ দিতে পারেন না।’ রানার রাগ এখনো কমেনি।

অসহায় ভঙ্গিতে সোহেলের দিকে তাকালেন বারকেইনহেইমার, চোখে সাহায্যের আবেদন।

সোহেল নির্লিপ্ত, চুপ করে থাকলো।

‘সত্যি কথা বলতে কি, গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে,’ ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বললেন এইচআরসি কর্মকর্তা। ‘মি. ডাচ জর্জ যে এ-ধরনের কিছু করতে পারেন, আমি ভাবতেই পারছি না…।’

‘ভাবতে পারছেন না, কারণ আপনারা অনভিজ্ঞ,’ কঠিন সুরে বললো রানা। ‘আপনি নিশ্চয়ই এ-কথাও ভাবতে পারছেন না যে ইতিমধ্যে দশ-বারোটা সীমান্ত পেরিয়ে প্যাসিমভকে নিয়ে এমন একটা দেশে চলে গেছে জর্জ যে তাদের কোনো খবরই যোগাড় করা সম্ভব নয়, বা খবর যোগাড় করা সম্ভব হলেও সে-দেশের সরকার ওদেরকে বহিষ্কার করতে বা কারো হাতে তুলে দিতে রাজি হবে না?’

সোহেল জানতে চাইলো, ‘মুক্তিপণের শর্তগুলো কি, মি. বারকেইনহেইমার?’

‘দশ মিলিয়ন ডলার।’

'নগদ?'

'সার্টিফায়েড চেক, জেনেভার অটোব্যাংক-এর একটা নাম্বারড অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। কাল রাত দশটার মধ্যে।'

'আর প্যাসিমভ?'

'রোডস টাউনের কোথাও মুক্তি দেয়া হবে, আমরা তাঁকে খুঁজে নেবো।'

দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলো সোহেল, 'আমরা মুক্তিপণ দেবো না। যা পারে করে নিক জর্জ। প্যাসিমভ ছাড়া আর কিছু নেই তার হাতে। ভদ্রলোকের কোনো ক্ষতি করবে সে, আমার বিশ্বাস হয় না। তাকে আমরা খুঁজে বের করবো, যেখানেই লুকিয়ে থাকুক। জিম্মির বদলে খুব বেশি হলে নিজের স্বাধীনতা পেতে পারে সে, তার বেশি কিছু না।'

গম্ভীর মুখে ডেস্কের দেরাজ খুললেন বারকেইনহেইমার, একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিলেন সোহেলের দিকে। 'আমার ভয়, অতো সহজ নয় ব্যাপারটা, মি. আহমেদ। আজ সকালের ডাকে পেয়েছি এটা, ব্ল্যাকমেইলারের চিঠি। পড়ে দেখুন, প্লিজ।'

টাইপ করা কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সোহেল আর রানা। পড়া শেষ হতে দৃষ্টি বিনিময় করলো ওরা। 'এতে বলা হয়েছে, এই একই মেসেজের একটা করে কপি আমেরিকান ও রাশিয়ানদের কাছেও পাঠানো হয়েছে,' বারকেইনহেইমারের দিকে ফিরে বললো সোহেল।

'ঠিক তাই।'

'চতুর শিয়াল! আমেরিকান ও রাশিয়ানরাও জানে, এইচআরসি-কে একই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবটা যে-কোনো

এক পক্ষকে দেয়া হলে সময় ক্ষেপণের কথা ভাবা যেতো। কোনো পক্ষই এখন আর সে-ঝুঁকি নিতে পারবে না। তিন পক্ষেরই ভয়, প্রতিপক্ষ না পুরস্কারটা ছিনিয়ে নেয়। পরস্পরকে আমরা বিশ্বাস করি না, এই অবিশ্বাসটাকেই কাজে লাগাচ্ছে জর্জ।'

'তারপর, প্যাসিমভ মুক্তি পেলে,' বললো রানা, 'নতুন আরেক প্রতিযোগিতা শুরু হবে-কারা তাঁকে আগে খুঁজে পায়।'

বারকেইনহেইমার বললেন, 'এ অতি জঘন্য কাজ! অন্যায়, অসৎ এবং নিন্দনীয়।'

'চিঠিটা অন্তত একটা রহস্যের সমাধান এনে দিয়েছে,' বললো রানা। 'এখন বুঝতে পারছি, কেন কর্নেল রুস্তমভকে অতো খুশি খুশি লাগছিল। প্যাসিমভকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এই খবরটা মিশরে থাকতেই পেয়েছিল সে, নতুন নির্দেশে রোডসে এসে তদন্ত চালাতে বলা হয়েছিল তাকে। তার জানা ছিলো না যে কিডন্যাপাররা আমাদের সাথেও যোগাযোগ করেছে বা পরদিন সকালে করবে।'

'সেজন্যেই কি তোকে লোকটা খুন করেনি?' জানতে চাইলো সোহেল।

'হতে পারে। কিংবা তার তরফ থেকে ব্যাপারটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিলো। নিজের হাতে না মেরে খানিকটা দয়া দেখালো আমাকে। এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত সে।'

'তাহলে তো,' বললেন বারকেইনহেইমার, 'মি. প্যাসিমভকে কিডন্যাপাররা রাস্তায় ছেড়ে দিলে খুশিই হবে কর্নেল লোকটা, সত্যি যদি চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে সে।'

'আয়োজনটা করার পিছনে জর্জের উদ্দেশ্য হলো, পুরস্কার

নিয়ে কাড়াকাড়ি করবো আমরা, পালাবার সুযোগ হবে তার।' চোয়ালে হাত ঘষলো রানা। 'তবে তার আয়োজনে ত্রুটিও আছে। ছোট্ট, তবে আছে।'

'কি সেটা, রানা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো সোহেল।

'ত্রুটিটা হলো, কাল রাত দশটা পর্যন্ত জর্জকে রোডসের আশপাশে থাকতে হবে, প্যাসিমভকে মুক্তি দেয়ার জন্যে।'

বারকেইনহেইমার উৎফুল্ল হলেন না। 'মি. জর্জ এরই মধ্যে হয়তো রোডস ছেড়ে চলে গেছেন। মি. প্যাসিমভ খুন হয়েছেন কিনা তাই বা কে বলবে?' গলার ভেতর কথা আটকে যাওয়ায় বিষম খেতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর চেহারায় উদ্বেগ আর চোখে বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠলো। এরপর কথা বললেন চিৎকার করে, 'আপনারা বসে আছেন কি মনে করে? শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভিজবে? মুক্তিপণের টাকা দিয়ে মি. প্যাসিমভকে উদ্ধার করা উচিত আমাদের। দেরি করা হলে ভদ্রলোক মারা যেতে পারেন, বুঝতে পারছেন না?'

'কেন, রাশিয়ানরা যদি মি. প্যাসিমভকে ফিরে পায়, অসুবিধেটা কি?' হঠাৎ শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমি যতোদূর জানি, মি. প্যাসিমভ স্বদেশেই ফিরে যেতে চান।'

'অসম্ভব! তা আমরা হতে দিতে পারি না! এতো কাঠ-খড় পুড়িয়ে তাঁকে আমরা রাশিয়া থেকে বের করে আনলাম কি এইজন্যে?'

'আগেই বলেছি, আপনাকে আমরা সি.আই.এ-র চর মনে করলে দোষ দিতে পারবেন না।' হাসলো রানা। 'আচ্ছা, বলুন তো, প্যাসিমভকে নিয়ে ঠিক কি করতে চান আপনারা?'

'কেন, তাঁর জন্যে আমরা ইউরোপ বা আমেরিকায় নিরাপদ

আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবো। তিনি যেখানে থাকতে চান সেখানেই তাঁকে রাখবো...।'

'তারমানে, তিনি যা চান তাই হবে, এইতো? প্যাসিমভ নিজে আমাকে জানিয়েছেন, তিনি রাশিয়ায় ফিরে যেতে চান। এখন বলুন, এ-ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে?'

'তিনি তাই বলেছেন?' বারকেইনহেইমার যেন চুপসে গেলেন। 'সত্যি?'

'সত্যি।'

কয়েক সেকেণ্ড মাথা নিচু করে চিন্তা করলেন বারকেইনহেইমার। তারপর বললেন, 'বেশ, বুঝলাম, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন। কিন্তু, তারপরও, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। যেহেতু এইচআরসি তাঁকে রাশিয়া থেকে বের করে এনেছে, তিনি ফিরে যেতে চাইলে তাঁকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বটাও পালন করবো আমরা। আমরা তাঁকে কে.জি.বি-র হাতে তুলে দিতে পারি না, কিভাবে জানবো তারা তাঁকে পাওয়া মাত্র খুন করবে না?'

'আপনার সাথে একমত আমরা,' বললো রানা। 'সেজন্যেই ভাবছি, আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি। প্যাসিমভ সাধারণ কোনো মানুষ হলে আলাদা কথা ছিলো। বর্তমান দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি।'

'কিন্তু মুক্তিপণের টাকা? অতো টাকা যোগাড় করা এইচআরসি-র পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কে.জি.বি-র পক্ষে অসম্ভব নয়,' বললো রানা। 'কাজেই আমরা ধরে নিচ্ছি, টাকাটা তারাই দেবে।'

'কিন্তু যদি না দেয়?'

'এটুকু ঝুঁকি নিতে হবে আমাদের,' বললো রানা। 'যদি দেয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে, কে আগে খুঁজে বের করতে পারে নিকোলাই প্যাসিমভকে।' সোহেলের দিকে ফিরলো ও। 'এখানে অন্তত আরো দু'জন লোক লাগবে, সোহেল। রাশিয়ানদের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখা দরকার।'

বারকেইনহেইমার এখনো সংশয়ে ভুগছেন। 'কিন্তু, ধরুন, কে.জি.বি. টাকা দিলো, কিন্তু মি. জর্জ মি. প্যাসিমভকে মুক্তি দিলো না? তখন কি হবে?'

'জর্জ ছেড়ে দেবে তাঁকে,' বললো রানা।

'কি করে জানলেন আপনি?'

'জর্জকে আমি চিনি। নগদ নারায়ণের ভক্ত সে। অভাব তার লেগেই আছে। আরো বড় কারণ, রাশিয়ানদের সাথে বেঈমানী করার সাহস তার নেই। টাকা পেয়ে প্যাসিমভকে যদি না ছাড়ে, রাশিয়ানরা ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে, এটা সে খুব ভালো করেই জানে।'

এয়ারপোর্টে যাবার পথে রানাকে লিফট দিলো সোহেল। 'মি. প্রেসিডেন্টের অনুগামী দলের সাথে আজ রাতে আমার দেখা করার কথা, বনে,' বললো সে। 'এখানকার পরিস্থিতি তোকেই সামলাতে হবে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একবার জ্বলার পর নিভে গেল স্ট্রীট ল্যাম্পগুলো, তারপর আবার জ্বললো। পশ্চিমের আকাশে এখনো খানিকটা লালচে আভা লেগে রয়েছে। পুরনো শহরকে ঘিরে থাকা উঁচু পাঁচিল ম্লান আকাশের গায়ে ভূতুড়ে আর রহস্যময় লাগলো।

‘প্রেসিডেন্টকে আমার ধন্যবাদ দিবি,’ বললো রানা।

‘এথেন্সে যাত্রাবিরতির সময় রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করবো,’ বললো সোহেল । ‘সাযযাদ আর নাঈম, চন্দন টিম লিডার, তোকে রিপোর্ট করবে। তবে দায়-দায়িত্ব সব তোর।’

‘ঠিক আছে, তবে কমাণ্ডপোস্ট আগলে থাকার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।’

‘জানি, তোকে দৌড়-ঝাঁপ করতে হতে পারে।’

‘আরেকটা কথা, ওরা যেন একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমার সাথে যোগাযোগ না করে।’

‘ঠিক আছে।’

মিউনিসিপ্যাল পার্কে ফেরিওয়ালারা দম্পতিদের ঘিরে ধরেছে, ফুল বা চীনাবাদাম না কিনলে পরিত্রাণ নেই। কয়েক মুহূর্ত পর রানার হোটেলের সামনে থামলো মার্সিডিজ। ছোট্ট চৌরাস্তাটায় প্রচুর লোকজন, কৃত্রিম ঝর্নার চারধারে বসে আছে আড্ডাবাজ যুবকরা, সুন্দরী মেয়ে দেখলে কেউ শিস দিচ্ছে, কেউ হাত দিয়ে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে শার্টের কলার বা মাথার চুল।

‘এরপর কি করবি তুই?’ জিজ্ঞেস করলো সোহেল। তাকিয়ে আছে হোটেলে প্রবেশপথের দিকে।

‘রঁদেভো হোটেলে ফোন করবো, খোঁজ নেবো মিলি পুলটিস কাজে ফিরে এসেছে কিনা। ওখানেই গান গায় সে।’

‘মেয়েটা হয়তো দরকারী অনেক কথা জানে,’ বললো সোহেল।

গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করলো রানা, কথা বললো জানালার দিকে ঝুঁকে, ‘ইন্টারকনের ক্যাসিনোতেও যাবো আমি।

ডাচ জর্জের একটা আড্ডা ওটা, ওখানে তার অনেক বন্ধু-বান্ধবও আছে।’

‘সাবধানে থাকিস, রানা।’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা। হাসলো, ‘রাস্তা পেরোবার সময় দুই দিক দেখে নেবো, গাড়ি ঘোড়া...’

মার্সিডিজ চলে যাবার পর প্রথম যেটা লক্ষ করলো রানা, নাবিকের ডেনিম পরা পেশীবহুল লোকটা রাস্তার ওপারে ফুটপাত ধরে হাঁটছে, সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে।

পরমুহূর্তে শিরদাঁড়ায় অনুভব করলো গান মাজলের কঠিন ধাতব স্পর্শ।

তিন

‘মাফ করবেন। দয়া করে গাড়িটায় উঠবেন, মি. রানা?’ অস্ত্রের পিছনে ভারি গলাটা টান টান, চাপা।

সোহেলের মার্সিডিজ এইমাত্র চলে গেছে, খালি জায়গাটায় আরেকটা মার্সিডিজ এসে দাঁড়ালো। গাঢ় নীল এটা। রানার মনে হলো, এই গাড়িটাকেই বোধহয় কোস্টাস অ্যারোনাফিসের ভিলার কাছে দেখেছিল ও। দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঢোকার কোনো ইচ্ছে নেই রানার। ‘কি ব্যাপার? কঠিন সুরে জানতে চাইলো ও। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলো চাষীর মতো দেখতে অস্ত্রের পিছনে লোকটা আর

কেউ নয়, লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি। কে.জি.বি-র আরেক লোক জাগোরস্কির পিছন থেকে আসছে। তৃতীয় একজন বসে আছে মার্সিডিজের ব্যাক সীটে। ডেনিম পরা লোকটা রাস্তা পেরুচ্ছে। ড্রাইভারকে নিয়ে ওরা পাঁচজন। রানা একা।

‘কথা পরে হবে, মি. রানা। দয়া করে গাড়িতে উঠুন। প্লিজ।’

পাঁজরে আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁচা নিয়ে ইতস্তত করছে রানা, মুখের ভেতরটা তেতো লাগছে। চারদিকে হাঁটাচলা করছে প্রচুর লোকজন, তবে অস্ত্রটাকে আড়াল করে রেখেছে জাগোরস্কির পিঠ আর গাড়িটা। কেউ অস্থির নয়, কাজেই পথিকরা ওদেরকে একটা দল বলে মনে করছে। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তীরবেগে ছুটে গেল একটা মোটর স্কুটার।

বন্দী হতে না চাইলে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে রানাকে।

ওর শরীর কোমরের কাছে মোচড় খেলো, হাত ঝাপটা দিয়ে পলকের জন্যে অস্ত্রটাকে আরেক দিকে সরিয়ে দিলো ও, তারপর জাগোরস্কির কব্জি ধরে তারই হাঁটুর ওপর সজোরে বাড়ি মারলো। রানার এতো কাছাকাছি দাঁড়ানো উচিত হয়নি তার, যদিও সেটা কে.জি.বি-র সমস্যা। ভোঁতা ম্যাকারভ পিস্তল ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটে গেল একদিকে, সেই সাথে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো জাগোরস্কি। কংক্রিট রাস্তার ওপর পড়ে পিছলে আরো খানিক দূর সরে গেল অস্ত্রটা। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কে.জি.বি. এজেন্টের দিকে মনোযোগ দিয়েছে রানা, জাগোরস্কির পিছনে রয়েছে সে। আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা, কোটের ভেতরে হাত ঢোকালো। তার দুই ঊরুর সন্ধিস্থল লক্ষ্য করে লাথি চালালো রানা, প্রতিপক্ষ স্যাঁৎ করে একপাশে সরে যাওয়ায় ব্যর্থ হলো সেটা। ফোঁস করে

নিঃশ্বাস ফেলে চরকির মতো ঘুরলো জাগোরস্কি, ধাক্কাটা পেটে গ্রহণ করলো রানা, কোমর ঝাঁকিয়ে মার্সিডিজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে সাহায্য করলো জাগোরস্কিকে। জাগোরস্কি গাড়ির গায়ে পিঠ দিয়ে পড়েছে দেখে সরাসরি তার নাক বরাবর ঘুসি চালালো রানা, অরক্ষিত নাকটাকে আক্ষরিক অর্থেই সমতল করে দিলো ও। দ্বিতীয় লোকটাকে নিরস্ত্র করার জন্যে মরিয়া হয়ে ঘুরলো, কিন্তু মনে হতাশা আর শরীরে শিরশিরে একটা ভাব নিয়ে অনুভব করলো, হেরে গেছে ও।

আরেকটা ম্যাকারভ অটোমেটিক লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দুই চোখের মাঝখানে।

এতোই পরিষ্কার একটা দৃশ্য, মুহূর্তটি হতভম্ব করে দিলো রানাকে। গান ব্যারেলের ভেতর কুৎসিত গভীরতা, উত্তেজনায় অধীর চ্যাপ্টা মুখটা যেন ভেঙচি কাটছে, পুরু ঠোঁট দুটো ভেতর দিকে ভাঁজ হয়ে ঢেকে দিয়েছে দু'সারি দাঁত।

পরমুহূর্তে পেশীবহুল একটা হাত ক্ষিপ্র সাপের মতো ছোবল মারলো, সেই সাথে প্রকাণ্ড একটা মুঠোর ইস্পাতকঠিন গিঁটগুলো থেঁতলে দিলো মুখটাকে।

মুঠোটার মালিক ডেনিম পরা লোকটা, যাকে ভুল করে ওদের দলের লোক বলে ভেবেছিল রানা...।

কে.জি.বি. এজেন্টের পতন ঘটলো যেন একটা ট্র্যাপ-ডোরের ভেতর দিয়ে। গাড়ির ভেতর থেকে অপর লোকটা চিৎকার করে কি যেন বললো, ক্যাঙ্গারুর মতো লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল রানা। সিকি সেকেণ্ড পর গাড়ি থেকে ভোঁতা আওয়াজ হলো, বেরিয়ে এলো একটা বুলেট।

রাস্তার ওপর কনুই আর হাঁটু দিয়ে ধীরগতিতে লাটিমের মতো ঘুরছে জাগোরস্কি, অস্ত্রের খোঁজে এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছে। রাস্তায় পিঠ দিয়ে পড়ে আছে দ্বিতীয় কে.জি.বি. এজেন্ট, বাতাস টেনে বুক ফুলিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে পাশ ফিরলো সে, ঢিলে হয়ে থাকা একটা চোয়ালে হাত বুলিয়ে সাড়া পাবার চেষ্টা করছে। ফুটপাতের সচল ভিড় যেন কড়া ধমক খেয়ে স্থির পাথর হয়ে গেছে।

ছুটলো রানা, একটা কোণ ঘুরলো, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো। প্রকাণ্ডদেহী লোকটা দৌড়াচ্ছে না বলে লাফাচ্ছে বলাই ভালো, চোখের নিমেষে রানার পাশে চলে এলো সে। কে.জি.বি. এজেন্টদের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'আগের জন্মে কি যেন বলেছিলে নামটা?' জিজ্ঞেস করলো ও, ইংরেজিতে।

ফ্যাচ-ফ্যাচ শব্দ হলো, প্রকাণ্ডদেহী লোকটা হাসছে। 'মনির,' বললো সে, বিশুদ্ধ বাংলায়। 'মনির হোসেন। চলুন, স্যার, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি।'

তাজ্জব বনে গেছে রানা। 'দাঁড়াও হে, এক মিনিট,' বলে মনির হোসেনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো ও। 'তুমি...তুমি বাঙালী?'

রানাকে বাংলা বলতে শুনে হাঁ হয়ে গেল বিশালদেহী মনির হোসেন।

'স্যার, আ-আপনিও তাহলে...ইয়া গাফুরুর রহিম!'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখলো, মার্সিডিজ থেকে লাফ দিয়ে নামলো ড্রাইভার, তার পিছু পিছু ব্যাক সীটের লোকটা। দু'জন মিলে ধরাধরি করে আহত লোকটাকে গাড়িতে তুললো। পরমুহূর্তে

ছুটলো মার্সিডিজ, সামনের খোলা দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিলো জাগোরস্কি।

'ওরা আপনাকে ধরার জন্যে এলো না কেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো মনির হোসেন, এখনো সশব্দে হাঁপাচ্ছে সে।

'আমার মতো ওরাও পুলিশের হাতে পড়তে চায় না,' বললো রানা। 'কপাল মন্দ ধরে নিয়ে সুযোগ থাকতে পালাচ্ছে।' মিশরে থাকতে ওরা যে ভুল করেছে তা বুঝতে পেরেছে কে.জি.বি. এজেন্টরা, সেটা সংশোধনের জন্যে ফাঁদ পেতেছিল। আবার ওরা ওকে ধরার জন্যে ফিরে আসবে, জানে রানা। বড় করে শ্বাস টেনে মনির হোসেনের দিকে ফিরলো ও, খুঁটিয়ে লক্ষ করলো তাকে।

'স্যার, ওরা কি রাশিয়ান?'

'শুধু রাশিয়ান হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম,' বললো রানা। 'রাশিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওরা, কে.জি.বি-র রুস্ত মভ গ্রুপ।' হঠাৎ খেয়াল হলো রানার। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

আবার সেই অশ্লীল ফ্যাচ-ফ্যাচ শব্দ করে হাসলো মনির হোসেন। 'আমি অনেক কিছু জানি, স্যার।'

'তোমার পরিচয় কি? আমার পিছু নিয়েছিলে কেন? আমাকে সাহায্যই বা করলে কি মনে করে?'

'আপনি, স্যার, মাসুদ রানা।' সবজান্তার হাসি ফুটলো মনির হোসেনের মুখে।

'তুমি আমাকে চেনো?'

'জ্বী, স্যার।'

'কে তুমি?'

গোল মুখ থেকে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঘাম মুছলো মনির

হোসেন। 'আমার আসল পরিচয়–বাঙাল ও কাঙাল, স্যার। ভুখা মানুষ। টাকার জন্যে হন্যে হয়ে আছি। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে চুরি তো আর করতে পারি না। দেশের নাম ডুববে। কিন্তু, স্যার, যদি জানতাম আপনি আমার দেশী...।'

'বেশি কথা না বলে নিজের পরিচয়টা দাও,' বিরক্তির সাথে বললো রানা ।

'বিক্রি করার মতো একটা গল্প আছে আমার কাছে, স্যার,' বললো মনির হোসেন, গম্ভীর। 'আপনি আগ্রহের সাথে শুনতে চাইবেন।'

তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো রানা।

'আপনি হোটেলে ফেরেন কিনা দেখার জন্যে দু'দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম, স্যার। আপনি এলেন ঠিকই, কিন্তু সাথে ফাঁপা আস্তিন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোক আপনার কাছ থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। কে উনি, স্যার?'

'তুমি চিনবে না,' বললো রানা।

'আমার আর দেরি করতে ভালো লাগছে না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আসুন, স্যার।'

ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করলো মনির হোসেন, ম্যানড্রাকি স্ট্রীটের দিকে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে তার পিছু নিলো রানা।

ঢাল বেয়ে প্লাটিয়া সিমিস-এ এলো ওরা, গথিক খিলানওয়ালা অস্ত্রাগারটাকে পাশ কাটালো, খিলানগুলোর মসৃণ করা পাথর কৃত্রিম আলোয় চকচক করছে। ভ্রমণ বিলাসীরা ঘুর ঘুর করছে

চারপাশে, চাপাকণ্ঠে বিস্ময়ধ্বনি, যেন ভয় পাচ্ছে জোরে কথা বললে প্রাচীন দেবতাদের ঘুম ভেঙে যাবে—যীশুর তিনশো বছর আগে তৈরি একটা মন্দিরের উঠনে তাঁদের মূর্তিগুলোই শুধু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ডানদিকে সাইমি গেট, ভেতরে তাকালে বাণিজ্যিক বন্দরের খানিকটা দেখা যায়, সে-যুগে নাম ছিলো এমবোরিয়ো, চারদিক থেকে দুর্গপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পাইরিয়াস থেকে আসা বেশিরভাগ জাহাজ আর নৌকো ওখানেই নোঙর ফেলতো। সাদা একটা লাইনার রয়েছে এই মুহূর্তে, কয়েকশো পোর্টহোল থেকে আলোর আভা বেরিয়ে আসছে।

হন হন করে ফ্রিডম গেট পেরিয়ে এলো ওরা। কেউ কোনো কথা বলছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা। উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছু চোখে পড়লো না।

রানাকে আকটি বুবুলা-র দিকে নিয়ে যাচ্ছে মনির হোসেন। প্রকাণ্ড বাঁধের ওপর উঠে এলো ওরা, ম্যানড্রাকি হারবারের সাগরমুখী দিকটাকে এই বাঁধই রক্ষা করছে। রানাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল মনির হোসেন। রানার চেহারায় বিস্ময় লক্ষ্য করলো সে। রানা দেখলো, সামনে কিছু নেই, আছে শুধু তিনটে প্রাচীন উইণ্ডমিল আর ফোর্ট সেইন্ট নিকোলাস, মাথায় লাইটহাউসের খুদে আলোটা জ্বলজ্বল করছে।

পুরনো শহর পিছনে ফেলে আসায় বাতাসে শীত শীত ভাব রয়েছে, বাঁধের নিচে নোঙর ফেলা কয়েকটা লঞ্চ আর স্টিমার দেখা গেল। হারবারের পানিতে আলোর প্রতিফলন চোখ-ধাঁধিয়ে দিলো ওদের।

দূরের কয়েকটা তাঁবু আকৃতির কাফে থেকে গান-বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে।

হাঁটার গতি এক সময় কমিয়ে আনলো মনির হোসেন, রানা পাশে আসার পর বললো, ‘আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভাবছেন, স্যার। ভাবছেন, এদিকে কেন নিয়ে এলাম আপনাকে। গল্পটাই সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করবে, স্যার। জায়গাটা আপনার নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না?’

‘আমি অপেক্ষা করছি,’ হাঁটতে হাঁটতে বললো রানা। ‘রাশিয়ানদের কথা তুমি কোত্থেকে জানলে?’

‘সবই সময় মতো জানতে পারবেন, স্যার। সবই তো আমার গল্পের অংশ। বিড়ালের ভাগ্যে যেমন শিঁকে ছেঁড়ে, তেমনি আমার ভাগ্যেও ছিঁড়েছে, দু’দিন অপেক্ষা করার পর আপনার দেখা পেয়েছি।’

‘আমি ফিরে আসতে পারি, এ-কথা তোমার মনে হলো কেন?’

‘হোটেলের রেজিস্টার দেখে। আপনি বিল মেটাননি। ডেস্ক ক্লার্ককে অল্প কিছু ড্রাকমা ঘুষ দিয়ে আপনার নামটাও আমি জেনে নিই।’ বাঁধের কিনারা থেকে নিচের দিকে থুথু ফেললো সে। ‘তা, স্যার, দেশে আপনার কে কে আছেন? শাদী করেছেন?’

‘ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাক,’ বললো রানা। ‘গল্পটা কি শোনাও দেখি এবার। আমার কথা তুমি জানলে কিভাবে।’

থামলো মনির হোসেন, রানার দিকে ফিরলো। ‘মেয়েটা সুন্দরী, স্যার। নাম…মিলি…পুলটিস। আপনি তাকে চেনেন, তাই না?’

বিস্মিত হলো রানা। কিছু বললো না ও। চিন্তা করছে।

‘গ্রীক মেয়ে, দেবীর মতোই দেখতে, কিন্তু ভারি ছটফটে। বেশ লম্বা, চোখ ফেরানো যায় না।’ ফ্যাচ-ফ্যাচ করে কুৎসিত হাসলো মনির হোসেন। ‘সেক্সি।’

‘কোথায় সে?’ চাপা গলায় গর্জে উঠলো রানা। নিচের ঠোঁট একবার কামড়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো মনির হোসেন। ‘যেখানেই থাকুক, এ-জীবনে আপনাকে দেখতে পাবে বলে আশা করছে না...।’

‘দেখতে চায় না বলে, নাকি...?’

‘তার ধারণা, নির্ঘাত আপনি মারা গেছেন, স্যার। পাঁচমনের সাথে তাকে আমি কথা বলতে শুনেছি...নামটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারি না, স্যার।’

রানার হার্টবিট অকস্মাৎ বেড়ে গেল। ‘প্যাসিমভ। তাকে দেখেছো তুমি?’

‘বুড়ো একদম বোবা সেজে আছে, স্যার। আহ্, স্যার, কি যত্ন! শেষ বয়েসে অমন সুন্দরী যদি পাই, স্যার, আমিও আরামে চোখ বুজে পড়ে থাকবো।’

‘প্রথম থেকে শুরু করো,’ বললো রানা, নির্দেশের সুরে।

‘প্রথম থেকে? ঠিক আছে। এক হপ্তার মতো হবে, পাথরের স্তূপে আটকা পড়ে ছিলাম আমি, স্যার। আমাদের জাহাজ কোম্পানী...।’

‘জাহাজ? নেমিসিস?’ দ্রুত জানতে চাইলো রানা।

‘কি?’

‘তোমাদের জাহাজের নাম নেমিসিস?’

‘না। তা কেন হবে? নাইট স্টার, স্যার। পানামায় রেজিস্ট্রি করা। যাই হোক, ক্যাপটেন আমাদেরকে জানালো, কোম্পানী

লালবাতি জ্বেলেছে। আমাদের বেশিরভাগ ক্রুকে বেতন ছাড়াই তীরে নামিয়ে দেয়া হলো। এরকম যে মাঝে-মধ্যে ঘটে না, তা নয়। অল্প কয়েকজন ক্রু নিয়ে জাহাজটা ফেরত গেল মার্সেলেস-এ। পকেটে বেশি টাকা নেই যে ভালো কোনো হোটেলে উঠবো বা ঘুষ দিয়ে আরেক জাহাজে কাজ জুটিয়ে নেবো। দেশে ফেরার তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই ওদিকের ওই উইণ্ডমিলে ঠাঁই নিলাম।'

অন্ধকারের ভেতর অস্পষ্ট কাঠামোটার দিকে হাত তুললো মনির হোসেন। 'তারপর, স্যার, তিন দিন আগে, হঠাৎ করে হাজির হলো উইণ্ডমিলে। মিলি, পাঁচমন, থুড়ি, প্যাসিমভ, আর ডাচ জর্জ নামে এক লোক। তখনও ভোর হতে দেরি আছে, স্যার...।'

ভালো করে উইণ্ডমিলটা দেখার চেষ্টা করলো রানা, মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দরজা বা নিঃসঙ্গ চৌকো জানালা দিয়ে বাইরে কোনো আলো আসছে না। 'তারা কি এখনো ওখানে আছে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো ও।

'না। তবে কোথায় আছে আমি জানি...মানে, আন্দাজ করতে পারি। আপনি ওদের খোঁজ পেতে চান, স্যার?'

'চাই।'

'খরচা আছে, স্যার।'

নামগুলো ঠিক বলেছে লোকটা, ভাবলো রানা। সন্দেহ নেই, আরো কিছু জানে সে। 'টাকা পাবে,' বললো ও। 'কিন্তু বিনিময়ে আমার উপকার হওয়া চাই।'

'আপনি আমার দেশী লোক, স্যার, আলোচনা করে একটা রফায় আসা যাবে,' বললো মনির হোসেন। 'কি জানেন, কথা

ছিলো ডাচ জর্জকে সাহায্য করবো আমি। সে আমাকে জানালো, রাশিয়ানরা প্যাসিমভকে ধরতে চায়, আমাকে তাদের পাহারাদার হিসেবে কাজ করতে হবে, দুই বা তিন দিন। পাঁচশো ডলার পাবো। বললো, আমাকে দেখতে হবে প্যাসিমভ যেন উইণ্ডমিল ছেড়ে বেরুতে না পারে। কারণ তাতে নাকি তার নিজেরই বিপদ হবে। আর, কেউ যদি এদিকে আসে, নয়-ছয় বুঝিয়ে তাদেরকে সরিয়ে রাখতে হবে।'

উইণ্ডমিলের সামনে চলে এলো ওরা। পাথরের বিশাল একটা ব্যারেল, মোচাকৃতি ছাদ। ভেতরে ঢুকে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালছে মনির হোসেন, ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা দীর্ঘ বাঁধের দিকে তাকালো রানা। কেউ ওদেরকে অনুসরণ করে আসছে না। মৃদু বাতাসে উইণ্ডমিলের খালি স্পারগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠলো। বন্দর থেকে ভেসে এলো বোটের হর্ন।

অজানা একটা আশংকা নিয়ে উইণ্ডমিলের ভেতর ঢুকলো রানা। মন থেকে অস্বস্তিবোধটা ঝেড়ে ফেললো ও, বগলের তলায় হাত দিয়ে ·৩৮-টার স্পর্শ নিলো একবার।

'প্যাসিমভ লোকটা কিন্তু, স্যার, হাবাগোবা নয়,' বললো মনির হোসেন। 'ডাচ জর্জ বেরিয়ে যেতেই আমার সাথে কথা বলার জন্যে মিলিকে পাঠালো সে। ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। মেয়েটা এসেই আমার সাথে রঙ-ঢঙ শুরু করলো। পুরুষমানুষ, স্যার, দেশে ফেলে এসেছি নতুন বউটাকে। ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। জিজ্ঞেস করলো, আমি সিগারেট খাবো কিনা। তারপর দুটো সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটে গুঁজে দিলো একটা। তারপর জানতে চাইলো, আমরা ওপর

তলায় যাবো কিনা? শুধু আমরা দু'জন, আর কেউ নয়।'

গা দুলিয়ে হাসলো মনির হোসেন। 'আপনি হলে লোভ সামলাতে পারতেন, স্যার? কিন্তু তারপর, সবেমাত্র তিন ফুট লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে জিভটা, আমাকে সতর্ক করে দিয়ে চিৎকার দিলো মেয়েটা। আমার ধারণা, শেষ মুহূর্তে ব্যাপারটা তার সহ্য হয়নি, পরিকল্পনাটা বাতিল করার সিদ্ধান্ত একাই নিয়ে ফেলে। প্রথম থেকেই জানতাম আমি, ওরা দু'জন একসাথে আছে। যাই হোক, ঘাড় ফেরালাম আমি, দেখলাম মদের একটা বোতল তুলে আমার মাথায় ভাঙতে যাচ্ছে প্যাসিমভ। বাধ্য হয়ে তার পেটে ঘুসি মারতে হলো। দেখুন না, বোতলটা ভেঙে গেছে।' পাথুরে মেঝেতে লাল রক্তের দাগ আর ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো দেখালো সে।

'কেন তোমার মনে হলো, প্যাসিমভকে সাহায্য করছে মিলি?' জানতে চাইলো রানা।

'মেয়েটা আমাকে সহ্য করতে পারছিল না। তার হাবভাব দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারি আমি। কিন্তু প্যাসিমভের প্রতি তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিলো, লোকটাকে কচি খোকা বলে মনে করে সে। সারাক্ষণ ফিসফাস ফিসফাস।' চেহারায় উদ্বেগ আর তিক্ততা নিয়ে প্রকাণ্ড মাথাটা দোলালো সে। 'পাঁচশো ডলার অবশ্যই আমার পাওনা হয়েছে।' রানার দিকে মুখ তুললো সে। 'কিন্তু টাকাটা আমি পাইনি, স্যার।'

'তুমি আশা করছো টাকাটা আমি তোমাকে দেবো?'

'যা শুনেছি, স্যার, বুঝতে অসুবিধে হয়নি প্যাসিমভ লোকটা খুব দামী কেউ হবে। আপনি তার খোঁজেই আবার ফিরে এসেছেন

রোডসে, তাই না, স্যার? হোটেলের সামনে এই ব্যাপারটা নিয়েই তো গণ্ডগোল বাধলো, ঠিক কিনা? রাশিয়ানরাও পাসিমভকে ধরতে চাইছে। তাকে ধরার জন্যে দরকার হলে আপনাকে খুন করতেও পিছপা হবে না ওরা।'

মনির হোসেনের ছোটো ছোটো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'বলে যাও।'

'আমার হিসেবে, স্যার, আমি যা জানি তার দাম পাঁচশো ডলারের অনেক বেশি।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে মনির হোসেন।

'আবার এক কানাকড়িও হয়তো নয়।'

'ধরুন, পাঁচশোর দ্বিগুণ?'

'কি করে বলি, কি জানো তাইতো এখনো শুনিনি।'

'ঠিক আছে, নয়শো ডলার। স্যার?'

'হতে পারে, তোমার তথ্যটা যদি নিরেট হয়।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিশাল ছাতিটা ছোটো করে আনলো মনির হোসেন। 'শালার বিদেশীদের সাথে হাত মেলাবার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না, স্যার।'

'কিন্তু তুমি তাদের শর্তে রাজি হয়েছিলে,' বললো রানা।

'গলাটা শুকিয়ে গেছে, স্যার। চলুন, ওপরতলায় গিয়ে কথা বলি। ওখানে একটা বোতল আছে।'

মনিরের হাতে লণ্ঠন, তাকে অনুসরণ করলো রানা। ও লক্ষ করলো, আলোর বেশিরভাগটাই আড়াল করে রেখেছে সে। শরীরটা বিশাল। বুদ্ধিশুদ্ধি বোধহয় সে-অনুপাতে যথেষ্ট নয়। তবে উদ্দেশ্যটা পরিষ্কারই বলা যায়। আটকে পড়া একজন নাবিক, তার

টাকা দরকার…।

ঠাণ্ডা, ফাঁপা একটা অনুভূতি রানার বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত।

তার টাকা দরকার…

এখনো যে লোকটা ডাচ জর্জের হয়ে কাজ করছে না, তার প্রমাণ কি? কি প্রমাণ আছে, প্যাসিমভ কিডন্যাপিঙে তারও একটা ভূমিকা নেই? রাশিয়ানদের হাত থেকে রানাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে সে, লোভ দেখিয়ে এখানে আনার জন্যে নয় তো? আসার পথে একটু একটু করে টোপ ফেলেছে সে, ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একটা তথ্য দিয়েছে, রানা যাতে ফাঁদটা টের না পায়।

ফাঁদ!

উইণ্ডমিলে ঢোকার মুহূর্ত থেকে অস্বস্তিবোধটার কারণ উপলব্ধি করতে পারলো রানা। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে প্রথম থেকেই সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা করছে।

চোখ তুলে ওপর দিকে তাকালো রানা, সিঁড়ির ধাপগুলো ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধাপগুলো টপকালো রানা। একটা বাঁক ঘুরলো ওরা। সামনের ধাপগুলোর মেঝেতে স্তুপ করা রয়েছে কাঠ আর লোহার যন্ত্রপাতি, কিছু পাথর। মেঝেতে এক ইঞ্চি খালি জায়গা নেই। শেষ কয়েকটা সরু ধাপ পেরিয়ে উঠে গেল মনির। তার পিছু নিলো রানা, ডান হাতটা শিথিল করে রেখেছে, অস্ত্র ধরার জন্যে তৈরি।

ওপরতলার ঘরে উঠে এলো ওরা, এখানকার সেইল-পাওয়ারড ড্রাইভ শাফট প্রকাণ্ড পেগ-গিয়ার-এর সাথে সংযুক্ত, ওগুলোই নিচের পাথরগুলোকে ঘোরায়।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো রানা। কেউ নেই এখানে।

তাহলে অস্বস্তিবোধটা দূর হচ্ছে না কেন?

লণ্ঠনের হলদেটে আলোয় আটফুটি একটা ফাঁক দেখলো রানা, ঘরটাকে দু'ভাগে আলাদা করেছে। মনির হোসেনের পেটমোটা ব্যাগটা পড়ে রয়েছে অপরদিকে। সস্তাদরের মদের বোতল আর ব্রাউন কাগজে জড়ানো খানিকটা রুটি আর পনিরও দেখতে পেলো রানা।

ফাঁকটার মাঝখানে একটা আট ইঞ্চি চওড়া তক্তা ফেললো মনির হোসেন, দুই হাত পরস্পরের সাথে চাপড়ে ময়লা ঝাড়লো। 'ওপারে পৌঁছে তক্তাটা সরিয়ে নিতাম, স্যার। ঘুমাচ্ছি, এই সময় কেউ যাতে উঠে এসে মাথায় লাঠি মারতে না পারে। যে-কোনো বন্দর শহরে নিজের ওপর আপনার নজর রাখতে হবে।'

কথাটা সত্যি। মনির হোসেনের সব কথার মধ্যেই সত্যির একটা ভাব আছে। রানা অনুভব করলো, পেশীগুলোর টান টান ভাব খানিকটা যেন কমলো।

সদ্য তৈরি সেতুর ওপর উঠলো মনির হোসেন, হাতে লণ্ঠন। তাকে অনুসরণ করলো রানা।

কাঁধের ওপর দিকে কথা বললো মনির হোসেন। 'আয়োজনটা ভালোই, কি বলেন, স্যার?'

উত্তর দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে গেল রানা, কিন্তু সুযোগ পেলো না।

পায়ের তলা থেকে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ উঠলো। মট করে ভেঙে গেল তক্তাটা।

'স্যার!' চিৎকার করলো মনির হোসেন।

রানা অনুভব করলো, খসে পড়ছে ও, তলপেট উঠে এসেছে মুখের কাছে, ওর চোখের নিচে লণ্ঠনের ঝাপসা আলোটা ঘুরছে। দেয়ালগুলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিলো রানা।

সশব্দে পড়ে চুরমার হয়ে গেল লণ্ঠনটা।

তারপর সব অন্ধকার।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরলো রানার। ধারণা করলো, নির্ঘাত নিজের বিছানায় শুয়ে আছে ও, স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে।

মনে হলো জ্বর আসবে, তা না হলে সারা শরীর ব্যথা করছে কেন? চারদিক থেকে কালো আয়না ঘিরে রেখেছে ওকে। কানে শব্দ ঢুকছে, সবই যেন প্রতিধ্বনি। ওর সচেতনতা যেন ভঙ্গুর–এই আছে, এই নেই।

স্থির কোনো একটা জায়গায় শুয়ে আছে ও।

চৌকাঠের সামনে হারবার, ভৌতিক বলে মনে হলো।

কিসের যেন একটা শব্দ হলো, পাথরের ওপর জুতোর ঠোঁট ঘষা খেলো। স্থির, অনড় থাকলো রানা। এতোক্ষণে বুঝতে পারছে, মনির হোসেনের ওপর পড়েছে ও, আর সেটাই ওর বেঁচে থাকার কারণ। ওপরতলার ঘরটার কথা মনে পড়লো, মনে পড়লো তক্তা আর পতনের কথা। কতোক্ষণ আগের ঘটনা? সময় সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই ওর। অজ্ঞান ছিলো এক মিনিট, না এক ঘন্টা?

সতর্কতার সাথে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জুতোর শব্দ।

চোখ বুজলো রানা। মনির হোসেন যে মারা গেছে, এ-ব্যাপারে ওর কোনো সন্দেহ নেই । ওর নিচে শরীরটা নিঃশ্বাস ফেলছে না,

হার্টবিটের কোনো লক্ষণ নেই।

বন্ধ চোখের পাতা ভেদ করে হলদেটে আলোর আভা লাগলো মণিতে, উৎসটা সম্ভবত টর্চ। জুতোর শব্দ একেবারে কাছে এসে থামলো। একটা হাত ওর কব্জি ছুঁলো, তুললো, তারপর ছেড়ে দিলো। আবার ধরলো।

খুনী।

রানার ওপর দিয়ে যা ঘটে গেছে, নিজেরই বিশ্বাস হয় না এক চুল নড়তে পারবে। তবে বাধা না দিয়ে খুন হতে রাজি নয় ও। কিছু একটা করতে হবে ওকে। মৃত্যু এড়াবার জন্যে কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে রানা। মনের কোণে সাহস আর ইচ্ছাশক্তি জড়ো করতে শুরু করলো ও।

ওর কব্জির নিচে শিরাটা খুঁজে নিলো খুনী। পালস পাবার চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে রানা।

ওর শক্ত মুঠো অবাক করে দিলো খুনীকে। তার হাতটা ধরেই মোচড় দিলো রানা, ব্যথায় ককিয়ে উঠলো লোকটা, টলে উঠলো। ভারসাম্য ফিরে পেলো সে, রানাও দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করলো ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। অন্ধকারের ভেতর রানার ডান হাত ছুটে গেল, আঘাত করলো একটা চোয়ালে, খপ করে ধরে ফেললো একটা কলার, মোচড় দিলো। ডান হাত দিয়ে লোকটার পেট আন্দাজ করে ঘুসি চালালো ও। ফুঁপিয়ে উঠলো আততায়ী, ঝুঁকে পড়লো নিচের দিকে। লোকটা পড়লো না, কারণ এখনো তার মোচড়ানো কলারটা এক হাতে ধরে আছে রানা। আবার ঘুসি মারার জন্যে ডান হাতটা…

‘না!’ আবেদন জানালো লোকটা।

উইণ্ডমিলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়া ধূসর রঙা আলোয় এতোক্ষণে তার মুখটা দেখতে পেলো রানা।

ডাচ জর্জ।

চার

ঝুঁকে থাকা মূর্তিটার ওপর বাগিয়ে ধরা ঘুসি নিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা । বিস্ময়ের ঘোরটা দ্রুত কাটিয়ে উঠলো ও, রাগ আর ব্যথাগুলো থাকলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিলো ওকে।

লোকটাকে যতো জোরে পারা যায় আঘাত করলো রানা, সরাসরি মুখে । সংঘর্ষের আওয়াজটা সন্তুষ্টির পরশ বুলিয়ে দিলো মনে। পিছন দিকে ছিটকে গেল ডাচ জর্জ, মেঝের ওপর বসে পড়লো, দোমড়ানো টর্চের পাশে।

অবাধ্য পশুর মতো এক পলকে তার পাশে চলে এলো রানা, দু’হাত দিয়ে সমানে চালালো চড়-কিল-ঘুসি। চোখের সামনে ভাঁজ করা হাত দুটো তুলে নিজেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ডাচ জর্জ। তার হাত দুটো এক ঝটকায় একপাশে সরিয়ে দিলো রানা।

‘ফর গডস সেক…!’ ফুঁপিয়ে উঠলো জর্জ।

পর পর আরো দুটো ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারালো সে।

সিধে হলো রানা, লাথি মেরে লোকটাকে খুন করার প্রচণ্ড ঝোঁকটাকে অনেক কষ্টে দমন করলো। এক পা পিছিয়ে এলো ও,

ক্রোধের লাগাম টেনে ধরেছে। সশব্দে হাঁপাচ্ছে ও। ঢোক গিললো, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছলো। ডাচ জর্জকে খুন করাটা বোকামি হয়ে যাবে, নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝালো ও । রুশ বিজ্ঞানীর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত ওর কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

টলতে টলতে মনির হোসেনের দিকে এগোলো রানা। প্রথমবারই ঠিক ধরেছিল ও, লোকটার পালস নেই। নামমাত্র আলোয় দেখার তেমন কিছু নেই, যদিও যা দেখলো তাতেই বমি পেয়ে গেল রানার। দ্রুতগতি একটা গাড়ির উইণ্ড শীল্ড কারো মুখের ওপর বিস্ফোরিত হলে এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখা যায়।

অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ঢুকলো কানে। ঘুরলো রানা। পেন্সিল টর্চের আলো ফেললো ডাচ জর্জের ওপর, উঠে বসার নির্দেশ দিলো।

বার দুয়েক কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হতে গিয়ে পারলো না জর্জ। এখনো সেই জাম্পসুট পরে আছে সে, নেমিসিসে ওঠার সময় যেটা গায়ে ছিলো। ভাঁজ বলে কিছু নেই, এখানে-সেখানে ময়লা লেগে রয়েছে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় উঠে বসলো সে। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এক হাতের তালুতে ভর দিয়ে থাকলো সে, অপর হাত দিয়ে ঘাড়টা ডলছে। 'আমাকে মারা হলো কেন, নিশ্চয়ই তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে?' হাঁপাতে হাঁপাতে, অভিযোগের সুরে জানতে চাইলো সে ।

'নিকোলাই প্যাসিমভকে কিডন্যাপ করেছো তুমি। খুন করেছো মনির হোসেনকে,' ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে বললো রানা, 'বেঈমানী করেছো আমার সাথে।'

'রাবিশ!' সজোরে নাক টানলো ডাচ জর্জ। টলমল করতে করতে নিজের পায়ে দাঁড়ালো সে। 'অল রাবিশ!'

পিস্তলটা বের করলো রানা, পিস্তল ধরা হাতটা ঢিলেঢালাভাবে ঝুলিয়ে রাখলো ঊরুর পাশে। 'আমাকেও তুমি প্রায় মেরে ফেলে-ছিলে...।'

'ফর গডস সেক, থামবে তুমি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো জর্জ। 'রাশিয়ানদের কীর্তি ওটা, বুঝলে! আমরা তিনজন এখানে ছিলাম– আমি, মিলি আর নিকোলাই প্যাসিমভ। মনির হোসেন আমাদেরকে সাহায্য করেছে। যেভাবেই হোক, রাশিয়ানরা ব্যাপারটা জেনে ফেলে। হয়তো হোসেনই...ঠিক জানি না।' আঙুলের ডগা দিয়ে চোখ দুটো ডললো সে।

'হয়তো মনিরই...কি?'

'সেই হয়তো ওদের সাথে একটা চুক্তিতে আসে...কে.জি.বি-র সাথে।'

'দু'মুখো সাপের ভূমিকা নিয়েছিল?'

'তোমার সাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল সে, দেয়নি? অসুবিধে কি? গল্পটা রাশিয়ানদের শোনায় সে, রাশিয়ানরা দুর্ঘটনার আয়োজন করে, হোসেন যাতে আর কাউকে কিছু জানাবার সুযোগ না পায়। ভাঙা তক্তাটা আমি দেখেছি, রানা। নিচের দিকে করাত দিয়ে বেশ খানিকটা কেটে রাখা হয়েছিল।'

জর্জের কথায় যুক্তি আছে, ভাবলো রানা। যদিও ঠিক তাই ঘটেছে কিনা সন্দেহ। 'মনির কি জানতো, প্যাসিমভ এখন কোথায় আছেন?'

'আমার...আমার তা মনে হয় না। না, জানতো না। তবে

আরো অনেক কথা জানতো সে। জানতো, তিনি আমার কাছে আছেন। জানতো মিলিও ব্যাপারটার সাথে জড়িত।'

'প্যাসিমভকে কোথায় রেখেছো তোমরা?'

'তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি আমি,' বললো জর্জ।

'সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ।'

জর্জের ভাড়া করা ফিয়াটে চড়ে রওনা হলো ওরা। মাঝরাতই বলা যায়, শহর খালি হয়ে গেছে, লোকজন দেখা গেল শুধু ডিস্কো-বার আর নাইটক্লাবগুলোর সামনে।

পিস্তলটা কোলের ওপর রেখেছে রানা। 'উইগুমিলে এলে কি মনে করে?' জানতে চাইলো ও।

'রোজই একবার করে তোমার হোটেলে খবর নিচ্ছিলাম, তুমি ফিরলে কিনা...,' শুরু করলো জর্জ।

'মনির হোসেনকে এড়িয়ে যাবার কারণ কি তোমার?' বাধা দিলো রানা। 'সে-ও তো হোটেলটার ওপর নজর রাখছিল। তার কাছে ঋণী তুমি, সেজন্যেই কি তাকে খুন করলে?'

'আ-আমি খুন করেছি...? তোমাকে না বললাম...,' বিস্ফোরিত হলো জর্জ।

'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি,' বললো রানা। 'তবে কি বলতে চাও শোনা যেতে পারে।'

'সত্যি কথা বলছি, হোসেনকে দেয়ার মতো টাকা আমার কাছে ছিলো না...।'

'বলে যাও।'

'পরে অবশ্যই তার পাওনা মিটিয়ে দিতাম আমি...।'

‘কি বললাম শুনতে পাওনি ? আগে তোমার গল্পটা শেষ করো।’

গাড়ি ঘুরিয়ে হাইওয়ে ওয়ান-এ উঠে দ্বীপের পুব দিকে যাচ্ছে জর্জ। চাঁদের আলোয় ওদের ডান দিকে শিরদাঁড়ার আকৃতি নিয়ে পাহাড়শ্রেণী দেখা গেল। ‘হোসেনের সাথে আমার দেখা হয়নি, কারণ হোটেলে খবর নিয়েছি ফোনে। ম্যানেজার লোকটাকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি। হোসেন যে তোমার খোঁজ করছে, সে-ই আমাকে তা জানায়। আজও ফোন করি আমি, সন্ধ্যার দিকে। ওরা বললো, তুমি ফিরেছো, তবে স্যুইটে নেই। আরো বললো, হোসেনকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাজেই ভাবলাম, উইণ্ডমিলে একবার ঢুঁ মারলে হয়, সে হয়তো ওখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে।’

‘দেখা যাচ্ছে সব প্রশ্নেরই উত্তর তৈরি করা আছে তোমার।’

‘যা সত্যি তাই বলছি।’ বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটলো জর্জের ঠোঁটে। ‘পরিস্থিতিটা অদ্ভুত লাগছে আমার । অস্ত্রটা যদি সরিয়ে রাখতে, স্বস্তি বোধ করতাম।’

জবাব দিলো না রানা, অস্ত্রটাও সরালো না।

বাঁকা চোখে রানার দিকে তাকালো জর্জ, তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রানার কঠিন দৃষ্টি থেকে বাঁচলো। ‘বুঝি, আমাকে বিশ্বাস না করায় তোমাকে তেমন দোষ দেয়া যায় না। বিশেষ করে আমি যখন তোমাকে সুয়েজ ক্যানেলে ফেলে এসেছি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছো, তোমার জন্যে অপেক্ষা করলে কি ঘটতে পারতো? সবাই আমরা কে.জি.বি-র হাতে ধরা পড়তাম, তাই না? সেটা কি ভালো হতো? তাছাড়া, আমার কোনো সন্দেহ

ছিলো না যে নিজেকে তুমি রক্ষা করতে পারবে। এসপিওনাজ জগতের অভিজ্ঞ হিরো, তোমাকে ঘায়েল করা কি এতো সহজ?'

রুডিনি পার্কের অন্ধকার প্রবেশ পথটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো গাড়ি। ওখানে প্রতি বছর ওয়াইন ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়, পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে। চাঁদের আলোয় পাশাপাশি অনেকগুলো ফোয়ারা, ফুলবাগান দেখা গেল ভেতরে।

'প্যাসিমভকে তুমি বারকেইনহেইমারের হাতে তুলে দাওনি কেন?' জানতে চাইলো রানা।

চোখা নাকের ভেতর থেকে বিদঘুটে একটা শব্দ বের করলো জর্জ। 'বারকেইনহেইমার? ওটাকে তো একটা গাধা বললেই হয়। প্যাসিমভের পেছনে রাশিয়ানরা লেগে আছে বুঝতে পেরে হিসেব করে দেখলাম, বারকেইনহেইমারকে দায়িত্ব দিলে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে সে, দ্বীপ থেকে ভদ্রলোককে নিরাপদে কোথাও সরানো তার কর্ম নয়। ভেবো না তোমাকে ফোলাচ্ছি, তোমার সাথে থেকে ইতিমধ্যে আমি শিখেছি এসপিওনাজ জগৎটা কি রকম ভয়ংকর। অনভিজ্ঞ, আনাড়ি লোক একদণ্ড টিকতে পারবে না এখানে।'

কোনো মন্তব্য করলো না রানা, পিস্তলটা আধ ইঞ্চি সরালো, নিঃশব্দে পেরিয়ে যেতে দিলো কয়েকটা মুহূর্ত। ড্যাশবোর্ডের আবছা আলোয় দেখলো, জর্জের ঠোঁট দু'একবার কাঁপলো। মিথ্যে কথা বলছে সে।

রানার দৃষ্টি অনুভব করে ব্যস্ততার সাথে বললো জর্জ, 'আমার মনে হলো, তুমি না ফেরা পর্যন্ত প্যাসিমভকে লুকিয়ে রাখা দরকার, তাই রেখেছি আমি। এর মধ্যে দোষের কি হলো? তাকে আমি খুশিমনে তোমার হাতে তুলে দেবো।'

‘তা তো দেবেই,’ রানার গলা এতোই শান্ত যে ভীতিকর শোনালো।

‘ভদ্রলোককে দ্বীপ থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাওয়া যদি সম্ভব হয়, একমাত্র তোমার পক্ষেই তা সম্ভব, রানা,’ বলে পিছনের পকেট থেকে রুমাল বের করে সরু গোঁফে লেগে থাকা রক্ত মুছলো সে, লাল হয়ে ওঠা রুমালটা দেখলো।

মিলির কথা ভাবলো রানা, মনে পড়লো মনির হোসেন বলেছে, প্যাসিমভকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে মেয়েটা। তার ভূমিকা রহস্যময় হলেও, ব্যাখ্যার অতীত নয়। নিকোলাই প্যাসিমভের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে সে, কথাটা মনে পড়ায় বিস্মিত হলো না রানা। প্রথমে মেয়েটা সম্ভবত ডাচ জর্জের সাথে হাত মিলিয়েছিল। কিংবা হয়তো আসল ব্যাপারটা কখনোই আঁচ করতে পারেনি সে। একগাদা মিথ্যে কথা বলে নিজের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করেছে জর্জ, সন্দেহ নেই। মিলিকে সম্ভবত বুঝতেই দেয়নি, ভদ্রলোককে কিডন্যাপ করেছে সে। মিলির কাছে গোটা ব্যাপারটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে আরো একটা কারণে, উদ্ধার পাবার পর প্যাসিমভ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, রাশিয়ায় ফিরে যেতে চান তিনি। মিলির ভূমিকা সম্পর্কে জর্জকে কিছু জিজ্ঞেস করার মানে হয় না, নিজের অপরাধ ঢাকার বা হালকা করার জন্যে সবার ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবে সে।

তবে, মিলি জোট বেঁধেছে নিকোলাই প্যাসিমভের সাথে। তার মানেই দাঁড়ালো, কে.জি.বি-কে সাহায্য করতে রাজি হবে সে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানা, ‘তুমি যদি প্যাসিমভকে কিডন্যাপ না করে থাকো, টাকা দাবি করে বারকেইনহেইমারের কাছে চিঠি

লিখলো কে?'

'টাকা? চিঠি?' চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠলো জর্জের। 'আশ্চর্য! এ-সব কি বলছো তুমি? টাকা বা চিঠির কথা আমি তো কিছুই জানি না।' ঢোক গিললো সে। 'সব ফালতু কথা।'

'জানতাম, এই কথাই বলবে তুমি।' রানা শান্ত।

'যীশুর কিরে, আমার কথা বিশ্বাস করো,' আবেদনের সুরে বললো জর্জ। 'আমার ধারণা, কাউকে নিশ্চয়ই কিছু বলেছিল হোসেন।'

'তো কি হলো?'

'তারা হয়তো এতোটাই জানার সুযোগ পায় যাতে ভান করতে অসুবিধে হয়নি প্যাসিমভ তাদের হাতে আছে...।'

'এতে কাজ হবে না, আরেকভাবে চেষ্টা করো।'

চুপ করে থাকলো জর্জ। হাইওয়ে থেকে সরু একটা লেনে নেমে এলো ফিয়াট। দু'পাশে গাছের নিখুঁত সারি, লক্ষ করলো রানা। ওরা সম্ভবত একটা জলপাই বাগানের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। উঁচু-নিচু রাস্তার ওপর ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি। ডানা ঝাপটে জানালার পাশ দিয়ে উড়ে গেল একটা বাদুড়। জর্জের জাম্পসুটের ওপরের দিকটা ঘামে ভিজে গেছে।

আচমকা, ফিসফিস করে, অস্বাভাবিক শান্ত গলায় জানতে চাইলো সে, 'রানা, তুমি কি আমাকে খুন করবে?'

'আমি যদি তোমার কোনো ব্যবস্থা না করি, কে করবে?' লোকটার মন থেকে চাপ কমাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলো না রানা। আলোচনার সুরে আবার বললো ও, 'তোমাকে গ্রীক কোর্টে পাঠানোর উপায় নেই। পুরো কাহিনীটা তাহলে বেরিয়ে

আসবে—নাম, তারিখ, স্থান ইত্যাদি। আমাদের পেশায় এ-ধরনের ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'ঠাণ্ডা মাথায় তুমি আমাকে খুন করতে পারো না!'

'কাজটা করতে আমার ভালো লাগবে না, তবে পারবো।' প্রায় চমকে উঠে আবিষ্কার করলো রানা, হেডলাইটের শেষ মাথায় ওটা কোস্টাস অ্যারোনাফিসের ভিলা।

'সাক্ষী থাকবে, রানা মিলি আর নিকোলাই প্যাসিমভ,' বললো জর্জ।

'মিলি…সে এখানে?'

মাথা ঝাঁকালো জর্জ। 'প্যাসিমভের দেখাশোনার কাজে আমাকে সাহায্য করছে। আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, মিলিও সমান দায়ী।'

'চুপ করো তো।'

'আমাকে যদি খুন করো, তাহলে তোমাকে…।'

'বললাম না, চুপ!'

'প্যাসিমভ যদি আমার হয়ে সাক্ষী দেন…?' আকস্মিক উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো জর্জ, গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করলো সে।

'বেরোও। আগে তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে,' বললো রানা। গাড়ি থেকে নেমে ফেলে আসা পথটার দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে চারদিকের আলো-আঁধারির ওপর চোখ বুলালো। ফিসফাস করছে গাছপালার পাতা। আকাশে মেঘ, মেঘের আড়ালে চাঁদ। দূরের আকাশে মিটমিট করছে তারা।

'ধরো এটা।' জর্জের হাতে পেন্সিল টর্চটা ধরিয়ে দিলো রানা, তারপর তার পিছু নিলো, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

গাছের ডাল থেকে পাকা একটা ফল পড়লো পিছনে কোথাও। কিচকিচ করে উঠলো একটা ইঁদুর । ভিলার নিচে, টেরেস আকৃতির বাগান আর সুইমিং পুলের সামনে ঈজিয়ান সাগর আছাড় খাচ্ছে পাথুরে সৈকতে । পুলের পানি যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ আর আকাশের প্রতিচ্ছবি।

ভিলার ভেতর কাঠ আর চামড়া পোড়া গন্ধ। মিশরীয় সারকফ্যাগাস-এর মাথা, গৌতম বুদ্ধের অমূল্য স্বর্ণমূর্তি, দেয়াল জুড়ে সাজানো প্রাচীন রোডিয়ান প্লেট—সব অদৃশ্য হয়েছে। স্ট্যাণ্ড আর শো-কেসগুলো খালি। অ্যারোনাফিসের বাড়ি থেকে মূল্যবান প্রতিটি জিনিস সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আয়না লাগানো দেয়াল ঘেঁষে এগোলো জর্জ, তাকে অনুসরণ করছে রানা। ফায়ারপ্লেসটাকে ছাড়িয়ে প্যানেল দিয়ে ঘেরা একটা চোরা-কুঠরিতে ঢুকলো ওরা। রানা ভাবলো, ভদ্রলোককে রাখা হয়েছে কোথায়? তবে কোনো প্রশ্ন করলো না। সাধারণ একটা আলোর সুইচে পেন্সিল টর্চের আলো ফেললো জর্জ, আঙুলের চাপে সেটাকে একপাশে সরিয়ে দেয়ার পর জানা গেল ভেতরে আরো একটা সুইচ রয়েছে, কালো।

'প্যাসিমভ আমার হয়েই কথা বলবেন, তুমি দেখো,' বললো জর্জ।

অপেক্ষা করছে রানা, ডান হাতে ধরা পিস্তলটাকে তৈলাক্ত বোঝার মতো লাগলো। গুঞ্জনটা অস্পষ্ট, প্রায় শোনা যায় না, প্যানেলের পিছন থেকে ভেসে এলো। তারপর হিস হিস শব্দে দু'ভাগ হয়ে গেল দেয়াল। ভেতরে একটা বড় আকারের এলিভেটর দেখলো রানা, বড় একটা খাট ফেলা যাবে ওতে।

‘তাহলে এই পথেই পালিয়েছিল অ্যারোনাফিস, বাড়িটায় যখন আগুন দিলো ওরা,’ বললো রানা। ·৩৮ দিয়ে ইঙ্গিত করলো ও। ‘তুমি আগে ঢোকো।’

‘চমৎকার আয়োজন, কি বলো? কোম্পানীর ইলেকট্রিসিটির ওপর নির্ভর করে না। কল বাটন মনিটর করে ব্যাটারি চালিত একটা সার্কিট, সেটাই গ্যাসোলিন জেনারেটর চালু করে, জেনারেটর পাওয়ার সাপ্লাই দেয় এলিভেটরে।’

‘তুমি জানলে কিভাবে?’ এলিভেটরে পা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘ডাউন’ বাটনে চাপ দিলো জর্জ। ‘অ্যারোনাফিস কিছুই আমার কাছে গোপন করেনি। নিজের ঢাক পেটাতে ভালোবাসে লোকটা।’

‘তাই নাকি?’

হাসিখুশি হয়ে উঠলো জর্জ, যেন আচরণে স্বাভাবিক ভাব এনে মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করছে। বারবার পিস্তলটার ওপর নেমে এলো তার দৃষ্টি। ‘আমি আর অ্যারোনাফিস ঠিক একই বৃত্তে বিচরণ করি না বটে, তবে আমাদের বৃত্ত দুটো পরস্পরকে ছুঁয়ে গেছে। বেশ কয়েক বছরের পুরনো সম্পর্ক। বিলাসবহুল ইয়টে মেজবান হিসেবে তার তুলনা মেলা ভার। মনে পড়ে, এক বছর হলো কি…।’

‘কোথায় নামছি আমরা? কি আছে সেখানে?’ বাধা দিয়ে জানতে চাইলো রানা, থামতেই স্থির হয়ে গেল এলিভেটর।

খুলে গেল দরজা। চওড়া একটা করিডর দেখলো রানা। আলোগুলো সিলিঙের কাছাকাছি, আড়াল করা। শেষ মাথায় করোগেটেড মেটাল দিয়ে তৈরি দরজা, সাধারণত ওয়্যারহাউসে

দেখা যায়।

'এই পথে একটা জেটিতে যাওয়া যায়,' বললো জর্জ। 'অ্যারোনাফিসের ইয়ট ওখানেই রাখা হয়, যখন বাড়িতে থাকে সে। বাড়িটা বানিয়েছে পুরনো একটা দুর্গের জায়গায়। এক সময় এস্কেপ টানেল ছিলো, অ্যারোনাফিস এটাকে সোজা আর চওড়া করেছে। পাহাড়ের ভেতরটা ছিলো অসংখ্য টানেলের সমষ্টি, সবগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

হলুদ রঙ করা একজোড়া ফর্কলিফটকে পাশ কাটালো ওরা। সমতল মেঝে সহ কয়েকটা ফ্রেইট কার দেখা গেল, ছোটো ছোটো চাকায় রাবারের আবরণ। এ-সবই ভারি কার্গো বহনের কাজে লাগে।

বড় একটা ইস্পাতের দরজার দিকে এগোলো ওরা। 'প্যাসিমভকে এখানে নিয়ে আসার আগে মেইন করিডর বাদে আর কোনো দিকে ঢুঁ মারার সুযোগ আমার হয়নি। কি পেয়েছি শুনলে তোমার পেশার একজন লোক প্রশংসা না করে পারবে না।'

'আমার পেশার সাথে কি সম্পর্ক?'

'জিনিসটা আন্তর্জাতিক উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে।'

'কি জিনিস?'

'অস্ত্র, রানা। টন টন অস্ত্র । অ্যারোনাফিস আসলে একজন আর্মস ডিলার। লেন-দেন করে টেবিলের তলা দিয়ে। তার বাজারের নাম ব্ল্যাকমার্কেট।' দরজাটার সামনে থামলো জর্জ। 'কি ব্যাপার, তুমি তো অবাক হলে না?' একটা ভুরু কপালে তুললো জর্জ।

'জানা ছিলো। প্যাসিমভ কি এখানে আছেন?'

'তুমি দেখছি সব সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকো!'

'দরজা খোলো,' নির্দেশ দিলো রানা।

'খুলছি, বাবা, খুলছি!' আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলো জর্জ। ছোট্ট একটা বাক্স খুলে ভেতরের লাল বোতামে চাপ দিলো সে, সশব্দে ওপর দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল দরজা। আলো জ্বাললো সে।

ভেতরে কেউ নেই।

'কোথায় তিনি?' তীক্ষ্ণ, কঠিন সুরে জানতে চাইলো রানা। 'কোথায় রেখেছো তাঁকে?'

শুকনো, সাদা হয়ে গেল জর্জের চেহারা। 'যীশুর কিরে, রানা, তাঁকে আমি এখানে রেখে গেছি! কামরার ভেতর গাদা গাদা রাইফেল, কাঠের বাক্স, গ্রেনেড আর বাজুকা ছিলো...।'

জর্জ বিস্ময়ে স্তম্ভিত, বিস্ময়ের আড়ালে তার আসল চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেছে। লোকটা মিথ্যে কথা বলছে কিনা ঠিক ধরতে পারলো না রানা। জর্জের অপরাধ সম্পর্কে ওর বিশ্বাসেও চিড় ধরতে শুরু করেছে। নিকোলাই প্যাসিমভ তাকে সমর্থন করবেন, বারবার কথাটা বলেছে সে। মিলিও প্যাসিমভের সাথে আছে, এ-কথা বলার সময় তার কণ্ঠ ও চেহারায় প্রত্যাশার ভাব ফুটে উঠেছিল। অথচ মুক্তিপণ দাবি করে লেখা চিঠিটা মিথ্যে নয়। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, জর্জই ওটা পাঠিয়েছে।

কামরাটার ওপর দ্রুত চোখ বুলালো রানা। গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে যথেষ্ট বড়। সিলিঙের সাথে অনেকগুলো আংটা ঝুলছে, সম্ভবত এক্সপ্লোসিভ রাখার ব্যবস্থা। 'তোমার সাথে পকেটনাইফ আছে?' হঠাৎ জানতে চাইলো রানা।

হাড়ের তৈরি হাতল সহ একটা ছুরি বের করলো জর্জ।

এক কোণে কয়েকটা বাক্স রয়েছে। বাক্সগুলো মোটা কর্ড দিয়ে বাঁধা, যেন ঢাকনিগুলো খোলার পর আবার ভালোভাবে লাগানো হয়নি। একটা একটা বাক্স বেছে নিয়ে কর্ডের বাঁধন কেটে ফেললো রানা, ভেতরে হ্যাণ্ডগ্রেনেড দেখা গেল। অন্তত এ-ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেনি জর্জ। কামরাটা অস্ত্র ও গোলা বারুদের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করতো অ্যারোনাফিস।

'শেষ কখন এখান থেকে বেরিয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আজ সকালে...মানে, কাল আর কি। সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে এখান থেকে। গোটা বাড়ি খালি করে... ।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' থমথমে চেহারা নিয়ে কামরার চারদিকে আবার চোখ বুলালো রানা।

রুদ্ধশ্বাসে শুরু করলো জর্জ, 'অ্যারোনাফিস ফিরে এসেছিল। সমস্ত কিছু নিয়ে গেছে সে...মিলি আর প্যাসিমভকেও!'

পাঁচ

'কি করবে এখন তুমি?' রানার হাত আর পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো ডাচ জর্জ।

'কোথায় যেতে পারে অ্যারোনাফিস?' ঠাণ্ডা চোখ রানার, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জর্জের দিকে।

‘যাবার জায়গা একটাই আছে, যদি গ্রীসে থাকে সে।’

‘কোথায়?’

‘তার হেডকোয়ার্টারে। পিরিয়াস-এর অফিস বিল্ডিং। ওখানে তার একটা স্যুইট আছে।’

হাতঘড়ি দেখলো রানা। ‘চলো, প্লেন ধরতে হবে,’ বলে দরজার দিকে ঘুরলো ও। জর্জ মিথ্যে কথা বলছে কিনা জানার ওই একটাই উপায় আছে।

‘তুমি একা যাও, একজন অন্ধও খুঁজে পাবে ওটা।’ জর্জের চেহারায় জেদ, ভুরু দুটো নিচে নামানো।

আবার ঘুরলো রানা, চোখে রাগ। ‘অ্যারোনাফিসের বন্ধু তুমি, ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করতে পারবে আমাকে। তাছাড়া, তোমাকে চোখের আড়াল করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।’

‘অ্যারোনাফিসকে তুমি চেনো না। ও আমাকে খুন করবে। দু’জনেই মারা যাবো আমরা। অ্যারোনাফিসের সাথে লাগতে রাজি নই আমি।’

রানার ওপরের ঠোঁট ভেতর দিকে ভাঁজ হয়ে গেল। ‘ঘোরো। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসো।’

‘কি!’

পিস্তল তাক করলো রানা। ‘বসো!’

কাঁপা হাঁটু নিয়ে বসে পড়লো জর্জ। কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে আতংকভরা চোখে তাকিয়ে আছে। ‘কি…কেন…আমি বুঝতে পারছি না…।’

‘মুখ ঘোরাও, নাকি চাইছো মুখে মারি?’ কঠিনসুরে জানতে চাইলো রানা।

তিনজনকে ডাকলো ডাচ জর্জ, ‘বাবা, ও-মা, যীশু।’ তারপর

আরেকজনকে। 'রানা, প্লিজ! প্লিজ, রানা। না, ভাই, ভাই রে...।'

'একবার বলবো। এইবারই শেষ,' ধমক দিলো রানা। 'এখুনি মরতে চাও তুমি, নাকি পরে অ্যারোনাফিসের সাথে?'

হাতজোড় করে সিধে হলো জর্জ। 'আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবো।'

এলিনিকন এয়ারপোর্টের পশ্চিম টার্মিনালের সামনে প্লেন থেকে নামলো ওরা, একটা ফোক্সওয়াগেন ভাড়া করলো। উত্তরপশ্চিম দিক ধরে এগোলো গাড়ি, সাগরের তীর ঘেঁষে। গোটা এলাকাটাকে অ্যাপোলো কোস্ট বলা হয়—হাউজিং কমপ্লেক্স, নাইটক্লাব, ক্যাসিনো, পাঁচতারা হোটেল, ইয়ট ক্লাব আর পর্যটন কেন্দ্র নিয়ে বিশাল বিস্তৃতি, প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার।

রানার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নেমিসিস। রোডস টাউনে অনেকক্ষণ ছিলো ও, চন্দন সরকারের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়েছে। টিম নিয়ে যথাসময়েই রোডসে পৌঁচেছে চন্দন। টিমের দু'জন সদস্য, সাযযাদ আর নাঈম, এরইমধ্যে কে.জি.বি-র দু'জন এজেন্টকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে—একটা ক্যাসিনোয় ট্যুরিস্টের ছদ্ম পরিচয় নিয়ে ঢুকেছিল তারা, ওদের চোখে ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু চন্দন উদ্বেগজনক খবর দিয়েছে রানাকে। পিরিয়াসে উদয় হয়েছে নেমিসিস, একটা ওয়্যারহাউস থেকে অনেকগুলো ব্যারেলের একটা কার্গো লোড করা হয়েছে জাহাজটায়।

নেমিসিস এখনো কে.জি.বি-র দখলে, ওয়্যারহাউসের বাইরে থেকে তাদের গলা শোনা গেছে।

রানা ধারণা করলো, কার্গোটা নিশ্চয়ই ইউরেনিয়াম। ওর

হয়তো আশা ছিলো, নেমিসিসকে ঘিরে ঝড়-ঝাপটা শুরু হওয়ায় কে.জি.বি. সম্ভবত তাদের ইউরেনিয়াম রাশিয়ায় ফেরত নিয়ে যাবে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু সে-ধরনের কিছু ঘটছে বলে মনে হয় না।

সোহেলের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে চন্দন, একটা আর-টি রেডিও বীকন রোপণ করতে হবে নেমিসিসে, কার্গো লোড করার সময়। বহু কষ্ট স্বীকার করে কাজটায় সাফল্য অর্জন করেছে চন্দনের টিম। বীকনটা উত্তর দিকে যাচ্ছে না, যাচ্ছে না দারদানেলেস বা কৃষ্ণ সাগরের দিকে।

নেমিসিস যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে, আফ্রিকা অভিমুখে, আবার।

সি.আই.এ. আর কে.জি.বি-র মধ্যে একটা ব্যাপারে অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সি.আই.এ. যেমন রাষ্ট্রীয় নীতি লঙঘন করে বন্ধু বা এমনকি শত্রু রাষ্ট্রকেও আর্থিক অথবা পণ্য সাহায্য দেয়, কে.জি.বি-ও তাই করে। নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে নীতিচ্যুত হওয়া ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। এমন হতে পারে, ভাবলো রানা, সোভিয়েত সরকার এই ইউরেনিয়ামের চালান সম্পর্কে কিছুই জানে না।

নেমিসিস যদি ইউরেনিয়াম সহ রাশিয়ায় না ফেরে, যে-ভাবেই হোক জাহাজটাকে থামাতে হবে। দায়িত্বজ্ঞানহীন অথবা অশুভ কোনো শক্তির হাতে চালানটা পড়ার আগে একটা কিছু না করলেই নয়। দরকার হলে ইউরেনিয়াম নষ্ট করে দেবে রানা।

পিরিয়াসে পৌঁছে গেল ফোক্সওয়াগেন। বাঁক নিয়ে জর্জিয়ো এ. এভিনিউয়ে উঠে এলো গাড়ি, সামনে কারাইস্কন স্কয়ার। চৌরাস্তার ফুল-আকৃতির ল্যাম্পপোস্ট আর ফোয়ারা ছাড়িয়ে এলো গাড়ি। শহরের প্রধান সড়কের সামনে একটা জেটি রয়েছে। দ্বীপটার ব্যস্ত

তম এলাকা, যদিও এই মুহূর্তে প্রায় নির্জন আর শান্ত। বেশিরভাগ শিপিং লাইন্সের অফিস রয়েছে এখানে। অ্যারোনাফিসের বিল্ডিঙটা সাদা, আটতলা। একই আকৃতির ভবন পাশাপাশি অনেকগুলো। কোনো সাইনবোর্ড নেই দেখে অবাক হলো রানা। কাঁচের দরজা, ভেতরে ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক, সিকিউরিটি গার্ড বলে মনে হলো।

জর্জকে চাপা গলায় সতর্ক করলো রানা, 'ওদেরকে বোকা বানাবার বুদ্ধি বের করো, তা না হলে আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'

'সেটা কোনো ব্যাপারই নয়,' আশ্বস্ত করলো জর্জ। 'তবে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, সময় থাকতে একটি বার ভেবে দেখো অ্যারোনাফিস কিভাবে তোমাকে গ্রহণ করবে, বিশেষ করে এখানেই যদি প্যাসিমভকে বন্দী করে রেখে থাকে সে।'

'ভয় পাওয়া উচিত অ্যারোনাফিসের,' বললো রানা। 'কারণ সে জানে না আমি তাকে কিভাবে গ্রহণ করবো।'

'তোমরা যে কোলাকুলি করবে না, এটুকু পরিষ্কার।'

দালানটার ওপর দিকে তাকালো রানা। টপফ্লোরে আলো জ্বলছে। খানিক দূরের রেলস্টেশন থেকে ট্রেনের হুইসেল ভেসে এলো। 'চলো, ভেতরে ঢোকা যাক।'

প্রবেশপথের দিকে এগোলো ওরা, পিস্তলটা জ্যাকেটের পকেটে ভরে রাখলো রানা, হাতটাও পকেটে থাকলো। কাঁচের দরজায় টোকা দিলো জর্জ। উঁকি দিলো একজন গার্ড, জর্জকে দেখে নিঃশব্দে হাসলো, চাবি বের করে খুলে ফেললো তালাটা।'

'গুড ইভিনিং,' গ্রীক ভাষায় বললো গার্ড, 'মি. ডাচ জর্জ।'

একই ভাষায় জবাব দিলো জর্জ, 'ওপরতলায় যেতে চাই হে।'

'অবশ্যই, স্যার,' বলেও পথ ছাড়লো না গার্ড, জর্জকে খুঁটিয়ে দেখলো সে। 'স্যার, আপনি কি কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন?'

'পড়েছিলাম, ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি, কোথাও তেমন লাগেনি। আমার সাথে ইনি মাসুদ রানা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পথ ছাড়লো গার্ড, ভেতরে ঢুকলো ওরা। এলিভেটরের বোতামে চাপ দিলো গার্ড। মধ্য বয়স্ক লোক সে, খুশি করার জন্যে উন্মুখ। অপর লোকটা অল্পবয়েসী, সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। দেয়ালের গায়ে অলসভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সে, চোখে উদ্ধত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কাঁচ ভেদ করে রাস্তার ওপর গিয়ে পড়লো রানার দৃষ্টি। কোনো লোকজন নেই। বগল থেকে ঘামের একটা ধারা নামছে, অনুভব করলো ও।

এলিভেটর থেকে কার্পেট মোড়া করিডরে নেমে এলো ওরা। পিয়ানো বাজার ভোঁতা, অস্পষ্ট আওয়াজের সাথে কিছু লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর ও হাসির আওয়াজ পেলো রানা।

'কোস্টাস অ্যারোনাফিসের পেন্টহাউসে স্বাগতম,' বললো ডাচ জর্জ। 'শুনতে পাচ্ছো? মনে হচ্ছে একটা উৎসব পার্টিতে এসে পড়েছি আমরা।'

করিডরে মৃদু আলো, শেষ মাথার দিকে পিস্তল তুললো রানা। 'ওদিকে কি আছে?'

'সার্ভিস এন্ট্রান্স।'

'চলবে। আগে বাড়ো।'

বেশ কয়েকটা খোলা দরজা পেরিয়ে একটা করিডরে বেরিয়ে এলো ওরা, তারপর কিচেন হয়ে চলে এলো ডাইনিং রুমে। পাশের

ঘর থেকে পিয়ানোর আওয়াজ আসছে।

নিঃশব্দ ও সতর্কতার সাথে একটা দরজা আধ ইঞ্চি ফাঁক করলো রানা। সুবেশী দশ-বারোজন অতিথি রয়েছে ভেতরে। কেউ কেউ আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছে, কয়েকটা মেয়ে হাঁটু তুলে সোফার ওপর বসেছে, মোজা পরা পা শরীরের নিচে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে মদের গ্লাস। একদিকে এক লোক মহা উৎসাহের সাথে গল্প শোনাচ্ছে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে শ্রোতারা। বাকি সবাই নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। কাঠের তৈরি লম্বা একটা পাখির পাশে ছোটোখাটো, চওড়া কোস্টাস অ্যারোনাফিসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো রানা। রাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল স্বনামখ্যাত এক রাজনীতিকের সাথে কথা বলছে সে। এখনো গাঢ় রঙের প্রকাণ্ড চশমা রয়েছে তার চোখে, যেন নিজের পেন্টহাউসেও যতোটা সম্ভব লুকিয়ে রাখতে হবে চেহারা। মিলি পুলটিসকেও দেখলো রানা, পিয়ানোর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে আরেক দিকে। এতোক্ষণ সে-ই সম্ভবত গান শুনিয়েছে ওদেরকে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, এখানে তাকে জোর করে নিয়ে আসা হয়নি। তার হাঁটাচলা, হাসিখুশি হাবভাব দেখে বোঝা গেল, অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে সে, এটা যেন তার নিজের ঘরোয়া পরিবেশ। লাল আভার মতো তাকে জড়িয়ে রেখেছে একটা শিফন, নিচের অংশ মেঝেতে লুটোচ্ছে। তার কালো চুল কাঁধের কাছে মস্ত খোঁপার আকৃতি পেয়েছে। কানের পাশে লাল ফুল। হলরুমের প্রবেশপথের কাছে দাঁড়ালো সে, মনে হলো পার্টিতে তার মন নেই, নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ণ।

জর্জের পাঁজরে গুঁতো দিলো রানা, ডাইনিং রুমের পিছন

দিকের একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এলো তাকে নিয়ে। প্যাসেজ থেকে একটা স্টাডিতে ঢুকলো ওরা। চারদিকে চামড়া মোড়া বই ভর্তি বুকসেলফ। একদিকে এন্ট্রান্স আলকোভ, ক্লজিটের দরজায় আয়না লাগানো, বড় আকারের সবুজ লতাগাছ ফুটে রয়েছে আয়নার গায়ে।

হাত বাড়ালেই মিলিকে ছুঁতে পারবে রানা।

দীর্ঘক্ষণ, গভীর মনোযোগের সাথে, কামরার প্রতিটি লোককে লক্ষ করলো রানা। কে কোন্ দিকে তাকাচ্ছে, মিলির দিকে কারো নজর আছে কিনা দেখে নিলো।

ছায়া থেকে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল রানার হাত, অপর হাতটা মিলির মুখ চেপে ধরলো। হ্যাঁচকা টানে শরীরটা সরিয়ে আনলো ও। টেনে আনলো স্টাডির দিকে। প্রথমে হিংস্র বিড়ালের মতো ধস্তাধস্তি করলো মিলি। তারপর কালো, পটলচেরা চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলো রানাকে, ঢিল পড়লো পেশীতে। স্টাডির ভেতর এসে দরজা বন্ধ করলো রানা।

ছাড়া পেয়েই কর্কশস্বরে ফিসফিস করলো মিলি, 'ডার্লিং! আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছো!'

'ও কি তোমাকে তাই বলেছে?'

'কে?'

ঘাড় ফেরালো রানা।

ডাচ জর্জ পালিয়েছে। এই মুহূর্তে সম্ভবত লেজে আগুন লাগা কুকুরের মতো ছুটছে সে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রানা, ভাবলো জর্জকে ধাওয়া করবে কিনা, তারপর মিলির দিকে তাকালো—শেষ পর্যন্ত হাতের চিড়িয়াটাকেই বেছে নিলো ও।

'জর্জ,' বললো রানা। 'সে-ই আমাকে এখানে আনলো।'

‘কেন?’ মিলির সুন্দর মুখে বিস্ময়ের মেঘ জমলো।

‘প্যাসিমভ–তার ধারণা, প্যাসিমভ এখানে আছেন।’

আরো যেন হতভম্ব দেখালো মিলিকে, মন্থরগতিতে মাথা দোলালো সে, যেন নিজের হতভম্ব ভাবটাকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এগিয়ে এসে রানার গলাটা দু’হাতে জড়িয়ে ধরলো সে, ‘তুমি বেঁচে আছো, আমার যে কি খুশি লাগছে। আমাকে…চুমো খাবে?’ সেন্টের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো রানার।

প্রায় ধমকের সুরে বললো রানা, ‘ওসব ভুলে যাও। আমাকে জানতে হবে প্যাসিমভকে কোথায় রাখা হয়েছে?’ মিলির হাত দুটো গলা থেকে নামিয়ে দিলো ও, মনের কানাচে উত্তপ্ত সীসা হয়ে রয়েছে জর্জ। বিশ্বাস নেই, পার্টির সব লোককে ওর পিছনে লেলিয়ে দিতে পারে সে। আর, সে যদি পালিয়ে যেতে পারে…’

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো রানার।

‘আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি কি আসলে ভালোবাসতে অক্ষম?’ ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলো মিলি।

‘ওদিকটা, মনে হচ্ছে, আমাকে ছাড়াও বেশ ভালোভাবে চালিয়ে নিতে পারো তুমি,’ বললো রানা।

‘ওহ! আর কি করার থাকতে পারে আমার? চাইলে, না চাইলেও, কোস্টাস সব সময় আমার পাশে আছে!’

রানা চাইলো, প্রতিবার মাত্র একটা বিষয়ে মাথা ঘামাবে। ‘শোনো, জর্জ আর প্যাসিমভের সাথে রোডসে ছিলে তুমি, ঠিক?’

‘হ্যাঁ।’

‘অ্যারোনাফিসের ভিলার নিচে, টানেলে?’

আবার হতভম্ব হয়ে উঠলো মিলির চেহারা। অস্বস্তির সাথে জানালো সে, ‘ওখানে তো আমরা যাইনি।’

মিলির কনুইয়ের ওপরটা খামচে ধরলো রানা, ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠলো মিলি। 'তাহলে কোথায় গিয়েছিলে?' নিঃশ্বাসের সাথে হিসহিস করে বেরিয়ে এলো প্রশ্নটা।

'প্রথমে একটা উইগুমিলে। তারপর লিনডোস-এ, লিনডোসের একটা পুরনো বাড়িতে।'

ঠাণ্ডা মুঠোয় নিয়ে কেউ যেন চেপে ধরলো রানার হৃৎপিণ্ড। সর্বনাশ হয়ে গেছে, ভাবলো ও। মিথ্যে কথা বলে এখানে এনেছে ওকে জর্জ, ওদিকে নিকোলাই প্যাসিমভ এখনো রোডসে রয়েছেন—জর্জ নিশ্চয়ই তাঁকে কোথাও বন্দী করে রেখেছে।

এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে জর্জ। অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

খপ্ করে মিলির একটা কব্জি ধরলো রানা। 'এসো!' খেঁকিয়ে উঠলো ও।

বাধা দিলো মিলি। 'কোথায়? তোমার বুঝি ধারণা, ইচ্ছে করলেই আমাকে চরকির মতো ঘোরাতে পারো তুমি?'

'জর্জ বাদে একমাত্র তুমিই জানো কোথায় রাখা হয়েছে প্যাসিমভকে। জর্জ পালিয়েছে, তাকে যদি ধরতে না পারি, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।'

এই সময়, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কামরার আরেক প্রান্ত থেকে ডাচ জর্জের গলা ভেসে এলো, 'দুঃখিত, ভায়া। কোথাও তোমরা যাচ্ছো না।'

ঝট্ করে দরজার দিকে ফেরার সময় পিস্তলটার কথা ভাবলো রানা। জ্যাকেটের ভেতর রয়েছে ওটা, বের করার সময় পাওয়া যাবে না। পরমুহূর্তে দেখলো, পিস্তল বের করার চেষ্টা না করে ভালো করেছে। ভুরু বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে কপালে, দোরগোড়ায়

দাঁড়িয়ে রয়েছে জর্জ, তার পাশে খর্বকায় কোস্টাস অ্যারোনাফিস, অ্যারোনাফিসের হাতে ছোট্ট একটা .৩২, সরাসরি রানার বুকের দিকে তাক করা।

এক গাল হাসি নিয়ে জর্জ বললো, 'তোমাকে এখানে আনার জন্যে আমার ওপর জোর খাটিয়েছিলে বলে ধন্যবাদ, রানা। তোমার এই আচরণের ওপরই ভরসা করেছিলাম আমি। তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি, কোস্টাসের সাথে আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক আজ নতুন নয়।'

অপেক্ষা করছে রানা, কি ঘটতে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে সচেতন। ডাচ জর্জের সরু মুখে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো জর্জ, 'মারো ওকে, কোস্টাস। গুলি করো। তা না হলে বুড়ো পাপার পাঠানো সমর উপকরণ থেকে নির্ঘাত বঞ্চিত হবো আমি।'

ছয়

'হাত দুটো তোলো, প্লিজ।' ইংরেজিতে বললো কোস্টাস অ্যারোনাফিস, শান্ত, নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বর।

রানা হাত তুলছে, ধীরে ধীরে এক পাশে সরে গেল মিলি।

'ওর কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে আমাকে দাও,' জর্জকে বললো অ্যারোনাফিস।

রানাকে সার্চ করলো জর্জ, পিস্তলটা হাতে নিয়ে পিছু হটছে,

যেন রানার দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ মুহূর্তের জন্যেও হারাতে চায় না।

রানার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন আহত পাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে। যদিও সাহসের সাথে, মুখে শান্ত হাসি নিয়ে বললো ও, 'আমাকে খুন করে নিজের জন্যে শুধু বিপদ ডেকে আনবে অ্যারোনাফিস।'

'তাই কি? পরিস্থিতি কি এতোই খারাপ?' তাচ্ছিল্যের সাথে জানতে চাইলো অ্যারোনাফিস।

'তোমার আর্মস স্মাগলিং সম্পর্কে একা শুধু আমি জানি না।'

'বেশ, আরো অনেকে জানলো, তো কি হলো? তারা কেউ দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নয়। তাদের সমর্থন আর প্রশংসা কেনা আমার পক্ষে সহজ কাজ।' কথা শেষ করে হাসলো সে।

'অন্য কোথাও পাঠানো হচ্ছিলো, দাম একশো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি, জিনিসটা ইউরেনিয়াম, তুমি হাইজ্যাক করেছো–এটাও একা শুধু আমি জানি না।'

'আচ্ছা! এটা সত্যি বিপজ্জনক তথ্য, রানা!' চোয়াল কঠিন হয়ে উঠলো অ্যারোনাফিসের।

'কোথায় যাচ্ছিলো জিনিসটা?'

'এতো কিছু জানো, আর এটা জানো না? লিমবেরি, লিমবেরি। আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশ। সেজন্যেই তো সাউদার্ন আফ্রিকার কোর্স বজায় রাখছিল নেমিসিস। আ ডিলেইং ট্যাকটিক। আশা করা যায়, লিমবেরি সরকারের বিশ্বাস তাদের ইউরেনিয়াম এখনো আসার পথে রয়েছে, এদিকে জিনিসটা আমি আরেক পার্টিকে হস্তান্তর করছি।'

মনে মনে আতংকিত হলো রানা। লিমবেরি শ্বেতাঙ্গশাসিত

নগণ্য একটা রাষ্ট্র হলে কি হবে, শাসকরা আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। তিন দিক থেকে কৃষ্ণাঙ্গশাসিত তিনটে দেশ ঘিরে রেখেছে লিমবেরিকে, দেশগুলোর পাঁচ-সাতটা চরমপন্থী রাজনৈতিক দল লিমবেরির কালোদের পক্ষ নিয়ে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের ভাড়াটে সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে হাজার হাজার গেরিলাকে সীমান্তে পাঠিয়েছে। জাতিসংঘর নিন্দা প্রস্তাব কানে তোলেনি লিমবেরি সরকার, অত্যাচারের মাত্রা দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছে তারা। কিছু দিন হলো, জাতিসংঘের তরফ থেকে লিমবেরিকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কালোরা সংখ্যায় বেশি, প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তা পেয়ে গেরিলা যুদ্ধে ভালো করছে তারা। লিমবেরি একবার হুমকি দিয়েছিল, সীমান্তগুলো থেকে গেরিলাদের হটিয়ে দেয়ার জন্যে দরকার হলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে তারা, অস্ত্রটা যদি হাতে পায়। পরে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিল, পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে প্রাণহানির কোনো ইচ্ছে তাদের নেই, সীমান্তগুলোয় শুধু তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে দিতে চায় তারা, যাতে সেদিকে কেউ পা বাড়াতে সাহস না পায়। বোঝা যাচ্ছে, হুমকিটা শুধু কথার কথা ছিলো না। লিমবেরি সরকার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্বভাবতই, প্রতিবেশী দেশগুলোও ছেড়ে কথা বলবে না। এখন যদি বাধা না দেয়া হয়, শেষ পর্যন্ত এই এলাকায় ব্যাপক যুদ্ধ বেধে যাবে, পরিণতিতে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

'কিন্তু,' বললো রানা, 'আমরা সবাই জানি গেরিলাদের সাহায্য করছে রাশিয়া। এ-ব্যাপারে রাশিয়ানদের ভূমিকা সত্যি প্রশংসনীয়। কেন তারা উইপন-গ্রেড ইউরেনিয়াম লিমবেরির মতো একটা দেশকে সাপ্লাই দিতে যাবে? এ অসম্ভব!'

‘অসম্ভব, তোমার সাথে আমি একমত,’ ঠোঁটে হাসি নিয়ে বললো অ্যারোনাফিস, তার গাঢ় রঙের চশমা আলো লেগে ঝিক্ করে উঠলো। ‘নেমিসিসের অফিশিয়াল গন্তব্য ছিলো ইটালি। রাশিয়ানদের ধারণা, ইণ্ডাস্ট্রিতে ইউরেনিয়াম ব্যবহারকারীদের পক্ষে মধ্যস্থতা করছি আমি।’

‘তোমার ভিলায় হামলা চালিয়েছিল কে.জি.বি., তাই না? তুমি ওদের নাগালের বাইরে ইউরেনিয়াম সরিয়ে দেয়ার আগেই ওরা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল।’

‘সেটা একটা সম্ভাবনা বটে।’

‘জানো নিশ্চয়ই, নেমিসিস এখন ওদের হাতে? তোমার ওয়্যারহাউস খালি করার পর জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।’

মাঝপথে নিঃশ্বাস আটকে গেল অ্যারোনাফিসের। ‘কি!’

‘গল্প-গুজব অনেক হয়েছে,’ হঠাৎ বাধা দেয়ার সুরে বললো জর্জ। ‘কাজটা এবার...।’

রানা বললো, ‘আমি অবশ্য শুধু নিকোলাই প্যাসিমভ সম্পর্কে আগ্রহী। ডাচ জর্জ তাকে লুকিয়ে রেখেছে। ইউরেনিয়াম উদ্ধারের জন্যে যা খুশি করো তুমি, আমার কিছু বলার নেই। তবে তোমার জায়গায় আমি হলে, এই পরিস্থিতিতে, অন্য কোনো বিষয়ে নিজেকে জড়াতাম না।’

‘ও, হ্যাঁ,’ বলে মাথা ঝাঁকালো অ্যারোনাফিস। ‘রুশ ভিন্নমতাবলম্বী। মিলির কাছ থেকে তাঁর গল্প শুনেছি বটে। মিলি তো তাঁর অন্ধভক্ত।’ জর্জের দিকে ফিরলো সে। ‘ভদ্রলোককে আটকে রেখেছো তুমি?’

‘আটকে রেখেছে মুক্তিপণ পাবার লোভে,’ তাড়াতাড়ি বললো

রানা। 'দশ মিলিয়ন ডলার চাইছে ও। কে.জি.বি. বা এইচআরসি পেমেন্ট করবে।'

'আচ্ছা,' শব্দটা চিন্তিতস্বরে উচ্চারণ করলো অ্যারোনাফিস।

ব্যাকুলতার সাথে শুরু করলো জর্জ, 'টাকাটা আমি তোমার সাথে ভাগ করে নেবো, কোস্টাস। এখন আমার সাহায্য দরকার, তার বিনিময়ে। কিন্তু, আগের কাজ আগে, বন্ধু। এই লোককে না মারলে বিপদে পড়বো আমরা। তুমি গুলি করছো না কেন?'

চট করে একবার মিলির দিকে তাকালো রানা, সাথে সাথে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো মেয়েটা। সত্যি যদি নিকোলাই প্যাসিমভের

অন্ধ ভক্ত হয় সে, তার এখনকার নির্লিপ্ত আচরণ মোটেও স্বাভাবিক বলা যায় না।

মিলির দিকে তাকালেও, অ্যারোনাফিসের হাতের প্রতি খেয়াল রয়েছে রানার, মিলির দিকে ফিরে গ্রীক কোটিপতিকে যেন ধারণা দিতে চাইলো ও, এখুনি গুলি করা হবে বলে আশা করছে না ও।

রানার দিকে স্থিরভাবে অস্ত্রটা তাক করে আছে অ্যারোনাফিস, অপর হাতটা তুলে ডাচ জর্জকে আশ্বস্ত করলো সে। 'দেনায় হাবুডুবু খাওয়া তোমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, মাই ফ্রেণ্ড। এর একটা ফয়সালা করার সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। না, আমি তোমার টাকা চাই না। আর রানার বাধা হয়ে দাঁড়াবার যে কথাটা বলছো...।'

'ইয়েস?' ব্যগ্রতার সাথে জানতে চাইলো জর্জ।

'ধরে নিচ্ছি রাশিয়ানরা রোডসে রয়েছে, মি. প্যাসিমভের খোঁজে, তাই না? যেমন, এইচআরসি-র লোকজনও রোডসে

রয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরা কোথায়? কে.জি.বি. থাকলে, সেখানে সি. আই. এ.-ও থাকবে, সেটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় তারা?'

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এলো কামরার ভেতর।

প্রথম কথা বললো রানা, 'সি.আই.এ-র নিঃসঙ্গ প্রতিনিধি আমাদের সাথেই আছে, তুমি বোধহয় তাকে চিনতে পেরেছো, তাই না, অ্যারোনাফিস?'

ডাচ জর্জের দিকে তাকালো অ্যারোনাফিস। 'আমার কেন যেন ধারণা হচ্ছে, এ-ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে।'

'আমার…কি আশ্চর্য! আমি কি বলবো!' নার্ভাস ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হাসলো জর্জ। 'আমার কি বলার থাকতে পারে!'

'তুমি সি.আই.এ. হলেও,' আশ্বাসের সুরে বললো অ্যারোনাফিস, 'আমার কিছু করার বা বলার নেই।'

'তোমাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কি, কোস্টাস? তুমিই বলো, আমি সি. আই. এ. হলে তোমাকে মুক্তিপণের ভাগ দিতে চাইতাম? ল্যাংলি ব্যাপারটা মানতো?'

'বেঈমানী করা যার স্বভাব, তা যে সে নিজের প্রতিষ্ঠানের সাথেও করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!'

'সবাই যখন রোডসে, আমরাও তাহলে সেখানে যাই না কেন?' রানার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মিলির দিকে ফিরলো অ্যারোনাফিস। 'কাপড় বদলে এমন কিছু পরো, সুইট ডার্লিং, দৌড়ঝাঁপ করতে যাতে অসুবিধে না হয়। তুমিই আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

'ইয়েস, ডার্লিং,' ত্রস্ত পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মিলি।

জর্জের চেহারায় বিস্ময়। ‘কিন্তু রোডসে কেন যাচ্ছি আমরা, কোস্টাস? ওখানে গিয়ে কি করবো?’

ঠোঁট মুড়ে হাসলো অ্যারোনাফিস। ‘কে.জি.বি-র সাথে যোগাযোগ করবো,’ বললো সে। ‘মাসুদ রানা হত্যাকাণ্ডের দায় তাদের ঘাড়ে চাপাতে পারলে মন্দ কি? কাজটা যে তারা আনন্দ আর উৎসাহের সাথে করবে, এ-ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।’

‘তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি আমি!’ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো ডাচ জর্জ। ‘ভারি চমৎকার হবে সেটা!’ রানার দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কাটলো সে, অশ্লীলভঙ্গিতে, তারপর একটা চোখ টিপলো। ‘কি হে, হিরো, ঠিক বলেছি না?’

রোডসের পুব উপকূল লিনডোসে পৌঁছুলো ওরা, ইতিমধ্যে দিগন্ত রেখার কাছাকাছি নেমে এসেছে চাঁদ। সম্ভবত যীশুর জন্মেরও হাজার বছর আগে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর একটা ছিলো লিনডোস। কালের বিবর্তনে শহরটা জেলেদের নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসীর গর্ব করার মতো প্রাচীন কীর্তি এখনো কিছু কিছু আছে, তার মধ্যে একটা হলো সাগরের দিকে লম্বা হয়ে থাকা ভূখণ্ডের ওপর দুর্গটা। এই দুর্গের চারদিকেই সাদা চুনকাম করা জেলেদের বাড়ি-ঘর।

পেন্টহাউসের ছাদ থেকে রওনা হয়েছে ওরা, হেলিকপ্টার ওদেরকে নামিয়ে দিয়েছে এলিনিকন এয়ারপোর্টে। তারপর মিলি ওদেরকে লিয়ার জেটে তুলে নিয়ে এসেছে রোডসে।

ড্রাইভারের সীটে বসেছে অ্যারোনাফিস, জেলেদের গ্রামে ঢুকে ইন্টারসিটি বাস ডিপোর পাশে একটা রেস্তোরাঁর সামনে থামলো

গাড়ি। গলিগুলো সরু আর ঘন ঘন বাঁক নিয়েছে, গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢোকা বোকামি হবে। বাস স্টপ থেকে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ওরা, বেশ খানিকটা ওঠার পর পাথরের ওপর সাদা চুনকাম করা একটা বাড়ির দিকে হাত তুলে ডাচ জর্জ ইঙ্গিত দিলো ।

শিশিরভেজা বাতাসে দারুচিনির গন্ধ। গ্রামের মাথায় ঝুলে রয়েছে দুর্গের বিশাল কাঠামো, কালো আকাশের গায়ে আকৃতিটাকে জ্যান্ত আর অশুভ বলে মনে হলো।

দরজার তালা খুললো জর্জ, পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে এলো ওদেরকে। অ্যারোনাফিস, এখনো ডিনারের জ্যাকেট সহ সুট আর গাঢ় রঙের চশমা পরে আছে, সবার পিছনে থাকলো, পিস্তলটা হাতে।

দুর্গের লাগোয়া কিছু কিছু বাড়ি আজও টিকে আছে। ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করে ওগুলো। কোনো কোনোটা মেরামত করা হয়েছে, রঙ করা হয়েছে সিলিং, দেয়ালের অনেক ওপরে তুলে দেয়া হয়েছে সিন্দুকগুলো, জলদস্যুদের ভয়ে। তবে এই বাড়িটা মেরামত করা হয়নি। নগ্ন কড়িকাঠ সিলিঙের অবলম্বন হিসেবে কাজ করছে, প্লাস্টার খসে গিয়ে দেয়ালের পাথর বেরিয়ে পড়েছে। সাদামাঠা একটা টেবিল আর বেঞ্চ দেখা গেল, সাথে খাড়া পিঠ সহ একজোড়া চেয়ার, বসার জায়গাটা বেতের তৈরি। সরু একটা লোহার খাট রয়েছে, কালো কম্বল দিয়ে ঢাকা।

বিছানায় শুয়ে আছেন নিকোলাই প্যাসিমভ, গোড়ালি দুটো এক করে বাঁধা, কব্জি দুটো পিছমোড়া করে। চুলে লেগে থাকা রক্ত শুকিয়ে গেছে।

‘একি দশা হয়েছে আপনার!’ আর্তনাদ করে উঠলো মিলি।

‘উনি বাধা দিচ্ছিলেন,’ বললো জর্জ। ‘কিন্তু ওঁনাকে না বেঁধে এখান থেকে বেরুই কিভাবে? তাই মাথাটা আস্তে করে দেয়ালের সাথে ঠুকে দিতে হয়েছে। তেমন লাগেনি, খুলির চামড়া সামান্য ছড়ে গেছে আর কি।’

‘ও কিছু না, মাই ডিয়ার,’ প্যাসিমভ বললেন। ক্লান্তি আর অবসাদে কর্কশ শোনালো তাঁর গলা। চোখ বড়বড় করে ওদের দিকে তাকালেন তিনি। দৃষ্টিতে রাগ যেমন আছে, তেমনি ভয়ও। নেমিসিস ত্যাগ করার পর খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে তাঁর মুখে। গায়ের টুইডের জ্যাকেটটা অসম্ভব নোংরা।

এক ছুটে তাঁর মাথার কাছে চলে এলো মিলি। কম্বলটা ভাঁজ করে প্যাসিমভের মাথার নিচে রাখলো সে। ‘পানি আনছি, ক্ষতটা এখুনি ধুয়ে দেবো,’ বললো সে। জর্জের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো সে। ‘তুমি একটা শুয়োর! নরকেও তোমার জায়গা হবে না। এতোটা নিষ্ঠুর তুমি হও কি করে?’ গলার রগ ফুলে উঠলো তার।

হঠাৎ কথা বললো অ্যারোনাফিস, ‘ওঁর কাছ থেকে সরে এসো। এদিকে।’

ইতস্তত করলো মিলি, তারপর ভয়ে ভয়ে নির্দেশটা পালন করলো। মিলির চোখে চোখ রেখে অ্যারোনাফিস বললো, ‘উনি আর বেশিক্ষণ ভুগবেন না, মাই ডিয়ার। তোমাকে আমি কথা দিলাম।’

‘ওঁর বাঁধনটা অন্তত খুলে দিতে পারো না, কোস্টাস?’

‘তা সম্ভব নয়।’

‘অন্তত এ-কথা বলতেই হবে যে মনির হোসেনের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছেন উনি,’ বললো রানা।

‘মনির হোসেন?’ রানার দিকে ফিরলো মিলি।

‘জর্জ তাকে খুন করেছে।’

রুদ্ধশ্বাসে জর্জের দিকে ঘাড় ফেরালো মিলি।

‘আমি বলবো, ব্যাপারটা ছিলো দুঃখজনক প্রয়োজন,’ জর্জের সরু মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটলো, গলার স্বরে ব্যঙ্গ। ‘রানার লাগছে, কারণ ওর দেশের লোক ছিলো সে। দ্বীপের সব লোককে বলে বেড়াবে হোসেন মিয়া, সে-ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ছিলো না।’ হাত তুলে রুশ বিজ্ঞানীকে দেখালো সে। ‘ওঁর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই, আজ রাতেই ওঁকে ছেড়ে দেয়া হবে।’

‘সম্ভবত আরো আগে,’ মন্তব্য করলো অ্যারোনাফিস।

‘সম্ভবত, হ্যাঁ,’ তাকে সমর্থন করলো জর্জ। ‘জেনেভা থেকে খবর আসবে, আমার অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেয়া হয়েছে, ব্যস। কিন্তু তার আগে কিছু করা যাবে না।’

‘উঁহুঁ, সেজন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই,’ বললো অ্যারোনাফিস, তার গাঢ় চশমা হলদেটে আলোয় ঝিক ঝিক করছে।

‘মানে?’

কোনো রকম ইতস্তত না করে অ্যারোনাফিস বললো, ‘মি. প্যাসিমভকে বাঁধার পর খানিকটা রশি নিশ্চয়ই বেঁচে গেছে, তাই না? খুঁজে বের করো, তারপর ওটা দিয়ে বাঁধো রানাকে।’

কি ঘটতে যাচ্ছে, রানা যেন উপলব্ধি করতে শুরু করলো। জর্জ রশি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, ভাব দেখে বোঝা গেল তার মনে কোনো আশংকা নেই । বিছানার তলা থেকে একটুকরো রশি কুড়িয়ে নিলো সে।

রানাকে বাঁধার কাজ করিয়ে নেয়ার পর জর্জকে আর দরকার

হবে না অ্যারোনাফিসের।

'তোমার ভিলায় এডওয়ার্ড গ্রীন কি করছিল বলো তো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ও, সে!' গম্ভীর হলো অ্যারোনাফিস। 'বেচারার ভাগ্য খারাপ। নেমিসিসে ছুরি খায় সে, প্রায় মরেই গিয়েছিল…।'

'কবে?'

'যে-রাতে কার্গো স্থানান্তর করা হয়, রোডসের…।'

'ছুরি খায়?' রানা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'তদন্ত করা সম্ভব ছিলো না, পরিস্থিতির কারণে। আমরা ধরে নিই, ক্রুদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিণতি ছিলো ওটা। আমরা তাকে আমার ভিলায় তুলে আনি। হাসপাতালে পাঠাবার ঝুঁকি নিইনি। গোপন ট্র্যান্সফারের কথা বলে দিতে পারতো সে।'

'তারপর দুর্ঘটনার শিকার হয় সে, কে.জি.বি. তোমার ভিলায় আগুন দেয়ায়?'

'তোমাকে তো বললামই, বেচারার কপাল মন্দ।'

একটা চেয়ার এনে সামনে রাখলো জর্জ, কর্কশস্বরে বললো, 'বসো।'

রশিতে গিঁট বাঁধছে জর্জ, তার মুখে লাথি মারবে কিনা চিন্তা করলো রানা। ছিটকে অ্যারোনাফিসের ওপর পড়বে সে।

তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গেল অ্যারোনাফিস, যেন রানার মনের কথা বুঝে ফেলেছে।

জর্জকে বললো রানা, 'তুমি যে এতোটা বোকা, আমার ধারণা ছিলো না। একেকটা গিঁট দিচ্ছো, নিজের ডেথ ওয়ারেন্টে একটা করে সীল পড়ছে।'

হাসলো জর্জ, কিন্তু মুখের চেহারা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো,

আওয়াজটা বেসুরো। সরু চোয়ালে ঘামের ধারা, ফোঁটাগুলো ঝুলছে চিকন গোঁফের দুই প্রান্তে। 'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না, রানা,' বললো সে। 'খেলা এখানেই শেষ তোমার। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তেই হয় আমাদের, মেনে নিতে হয় পরাজয়। ভুল করেছো আগেই, এখন আর তা সংশোধনের সুযোগ তোমার নেই।'

'বিপদগ্রস্ত একজন লোকের কাছ থেকে বিপদ থেকে বাঁচার উপদেশ শুনতে রাজি নই আমি,' জবাব দিলো রানা, অনুভব করলো গোড়ালিতে শক্ত কামড় দিলো রশির বাঁধনটা। চেয়ারের সাথে বাঁধা হলো ওকে।

'ডিভাইড অ্যাণ্ড কংকার? এই কি তোমার সর্বশেষ, বেপরোয়া প্ল্যান? কৌশলটা একদম বাসি হয়ে গেছে, রানা। হাস্যকর।' চেয়ারের পিছনে চলে এলো জর্জ, রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধলো।

'পিস্তল হাতে তোমার বন্ধু কিন্তু হাসছে না,' বললো রানা। মিলির দিকে ছুটে গেল ওর দৃষ্টি, কি যেন খুঁজলো, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো।

মিলির চোখের কালো মণি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল, যেন রানা আর নিজের মাঝখানে দেয়াল তুলে দিলো একটা। অ্যারোনাফিসের দিকে ফিরলো সে। 'ওকে নিয়ে কি করবে তুমি, কোস্টাস?' জিজ্ঞেস করলো, হাত তুলে দেখালো রানাকে।

'এখানে ফেলে যাবো। রাশিয়ানরা এসে দেখুক ওকে। কোথায় আসতে হবে জানবে তারা, যাতে জানে তার ব্যবস্থা করা হবে।'

'বেশ, ভালো কথা, তোমার যা খুশি করো,' বললো মিলি। 'আমি বরং চলে যাই। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই বাস পেয়ে

যাবো। এখানকার কাজ শেষ করে, আমার অ্যাপার্টমেন্টে পাবে আমাকে।'

'কোথাও যাচ্ছো না তুমি,' বললো অ্যারোনাফিস। 'অপেক্ষা করো, আমার সাথে গাড়িতেই ফিরবে।'

'দেখো, ডার্লিং, আমাকে থাকতে বাধ্য করো না।' রানার দিকে চট করে একবার তাকালো মিলি। তার দৃষ্টির অর্থ রানার বোধগম্য হলো না।

'তুমি থাকছো,' কঠিন সুরে বললো অ্যারোনাফিস।

সিধে হলো জর্জ। 'এমনভাবে বেঁধেছি, ওর বাপেরও সাধ্য নেই খোলে।' দুই হাত এক করে ঘষলো সে। 'এখানের কাজ শেষ।'

'প্রায়,' দ্রুত, ব্যস্ত কণ্ঠে বললো অ্যারোনাফিস। 'ওর গলায় একটা ফাঁস পরাও, ফাঁসের রশি গোড়ালির সাথে বাঁধো। চেয়ারে বসা অবস্থায় যাতে বেশি লাফাতে না পারে।'

ফাঁসটা রানার মাথায় গলালো জর্জ, রশিতে টান দেয়ায় ঘাড়টা পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো। কাজটা শেষ করলো জর্জ, কোনো রকমে দম ফেলতে পারছে রানা।

'গুড,' বললো অ্যারোনাফিস। 'এবার তুমি আর মিলি আমাকে সাহায্য করো, মি. প্যাসিমভকে গাড়িতে তুলতে হবে।'

'কেন?' জর্জের অস্বস্তি চাপা থাকলো না। 'দেখো, কোস্টাস, এখানে বেশি সময় নষ্ট করা মানে...।'

'আরে, শান্ত হও, দোস্ত। রানার কথায় তুমি ঘাবড়াচ্ছো নাকি? তুমি ঘাবড়ালে ওকে খুশি করা হবে, বুঝতে পারছো না?' চারদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো অ্যারোনাফিস, মেঝে থেকে এক টুকরো কাপড় তুলে নিয়ে রানার মুখে গুঁজে দিলো সে। 'এসো, মি.

প্যাসিমভকে তুলে নিয়ে যাই।' রেগে গেছে সে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

ইতস্তত করলো জর্জ, যেন উপলব্ধি করতে পারছে ঘটনাপ্রবাহ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

অ্যারোনাফিস বললো, 'দু'জনকেই যদি এখানে রেখে যাই, কি ঘটবে তুমি বুঝতে পারছো না? পরস্পরকে সাহায্য করবে ওরা। সেটাই কি তুমি চাও?' তার কথায় নরম সুর। 'তাছাড়া, রানার খোঁজে কে.জি.বি. এজেন্ট এসে যদি মি. প্যাসিমভকে দেখতে পায়, পরে কি আর তারা তোমাকে মুক্তিপণের টাকা দেবে?'

'কিন্তু ওঁকে আমরা কোথায় নিয়ে যাবো?'

চট করে হাতঘড়ি দেখলো অ্যারোনাফিস। 'ইতিমধ্যে সম্ভবত আমার ইয়ট মানড্রাকি হারবারে নোঙর ফেলেছে। এসো, এসো–একটু পরই ভোর হয়ে যাবে।'

চলে গেল ওরা। নিকোলাই প্যাসিমভের মুখে কাপড় গোঁজা হয়েছে, অ্যারোনাফিস আর জর্জের মাঝখানে একটা বস্তার মতো ঝুলে থাকলেন তিনি। পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে।

কামরার ভেতর রানা একা। ও কি মৃত্যুর প্রহর গুনছে? কে জানে কখন আসবে কে.জি.বি.।

না, হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করা ওর স্বভাব নয়। পারুক আর না পারুক, বাঁচার চেষ্টা করতে হবে ওকে। বাঁধন ঢিলে করার জন্যে হাত আর পা মোচড়াতে শুরু করলো রানা। আকস্মিক টান পড়ায় ফাঁসটা চেপে বসলো গলায়, কয়েক সেকেণ্ড নিঃশ্বাস ফেলতে পারলো না। শব্দটা প্রথমে চেনা না গেলেও, পরে বুঝলো ওর গলা থেকেই বেরুচ্ছে । বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে ও। নড়লেই তীব্র ব্যথায় অবশ হয়ে গেল শরীর। এক সময় স্থির হয়ে

গেল ও। পরিস্থিতি সত্যি খারাপ, আশা করার মতো কিছু নেই।

কয়েক মিনিট পর অ্যারোনাফিস আর জর্জকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো রানা, ওদের সাথে মিলিও রয়েছে। কামরায় ঢোকার সময় কথা বলছে মিলি। 'গাড়িতে অপেক্ষা করতে পারতাম আমি,' বললো সে।

'মি. প্যাসিমভের সাথে একা তোমাকে রেখে আসবো ভেবেছো?' জবাব দিলো অ্যারোনাফিস। 'বিশেষ করে যখন জানি ভদ্রলোকের সাথে তোমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে?'

'তারমানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না!' চেঁচিয়ে উঠলো মিলি।

'না, করি না,' শান্তভাবে, মুখের ওপর বলে দিলো অ্যারোনাফিস।

জর্জ বললো, 'কিন্তু এ-সবের মানে কি? এখানে আর কি করার আছে আমাদের?'

'মানে?' অ্যারোনাফিস হাসলো না। 'মানে হলো, বন্ধু, তোমাকে বিদায় নিতে হবে।'

'কিন্তু...নাহ্, তুমি সিরিয়াস নও, কোস্টাস।' জর্জের ঠোঁট কাঁপছে। ভয় আর অবিশ্বাসে ঝুলে পড়েছে তার চোয়াল।

'তুমি একটা রামছাগল, তোমার স্বভাবই হলো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া। নাগাল পাবে না, এমন জিনিস ধরতে চেয়েছো তুমি। আমার কোনো সন্দেহ নেই, তোমার বিরুদ্ধে রানারও এই একই অভিযোগ রয়েছে।' জর্জের বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করলো অ্যারোনাফিস।

পিস্তলের মাজলের ওপর চোখ রেখে পিছিয়ে যাচ্ছে জর্জ। 'তোমাকে বললাম না, অর্ধেক ভাগ দেবো? পাঁচ মিলিয়ন ডলার,

কোস্টাস। মনে রেখো, আমাকে ছাড়া টাকাটা পাবার কোনো উপায় নেই।'

'আমার কোনো আগ্রহ নেই। সত্যি বলছি।'

'দাঁড়াও!' রুদ্ধশ্বাসে হরহর করে কথা বলছে জর্জ, যেন কথা দিয়ে সে তার মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। 'ঠিক আছে, পুরো টাকাটাই তোমার। আমাকে শুধু এক হাজার ডলার দিয়ো। তাও শুধু দেনা আছে বলে চাইছি…।'

'তুমি আসলে এখনো বুঝতে পারছো না,' বললো অ্যারোনাফিস। 'আমি পেতে চাইছি একশো মিলিয়ন ডলার, একশো মিলিয়ন ডলার মূল্যের ইউরেনিয়াম অক্সাইড। মি. প্যাসিমভকে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, আমার ধারণা রাশিয়ানরা খুশি হয়ে আমার সাথে একটা ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসবে–আফটার অল, ইউরেনিয়ামের জন্যে টাকা দেয়া হয়েছে তাদেরকে। মুক্তিপণ ছাড়া মি. প্যাসিমভকে ফিরে পেলে ইউরেনিয়ামের কথা ভুলে যেতে ওরা আপত্তি করবে না।'

মিলির দিকে ফিরলো জর্জ। 'ফর গডস সেক, কিছু একটা বলো তুমি!'

মিলি শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকলো, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'প্যাসিমভকে কিডন্যাপ করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না,' চিৎকার করলো জর্জ, মিলির ঘোর ভাঙাবার চেষ্টা করছে। 'আমার হাতে এসে পড়েন উনি। তারপর…তারপরই চিন্তাটা আমার মাথায় আসে।'

'সি.আই.এ. তোমার সাথে যোগাযোগ করেনি?' সবজান্তার শান্ত সুরে প্রশ্ন করলো অ্যারোনাফিস। রানার মুখ বন্ধ, তা না হলে

ঠিক এই প্রশ্নটাই করতো ও।

'ক. . .করেছিল, কিন্তু তাদেরকে আমি কোনো কথা দিইনি...'

'আমার আর কিছু জানার বা বলার নেই।' শক্ত হলো অ্যারোনাফিসের চোয়াল, হাত লম্বা করে জর্জের হার্ট বরাবর লক্ষ্যস্থির করলো সে।

হাত দুটো ঝট করে সামনে বাড়িয়ে ঘন ঘন নাড়লো জর্জ। 'কোস্টাস! না, কোস্টাস...।'

তীক্ষ্ণ, ছোট্ট একটা শব্দ হলো।

'আহ্' করে উঠলো জর্জ।

মিলির চিবুকের ওপর রক্ত দেখলো রানা। গুলির শব্দ হতেই নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে। একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

সাত

আর কতো দেরি? কতোক্ষণ পর আসবে কে.জি.বি.?

আন্দাজ করতে পারলো না রানা, কারণ ওর জানা নেই অ্যারোনাফিস কখন যোগাযোগ করবে রাশিয়ানদের সাথে। রোডস টাউন মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। কে জানে ক'টা বাজে এখন, ঘড়ি দেখার উপায় নেই, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ভোর হবে কখন?

চেষ্টা করলে কে.জি.বি.-র সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবে অ্যারোনাফিস। ক্ষমতা, অর্থ, প্রভাব কোনো কিছুরই অভাব নেই লোকটার, তা না হলে এতো দীর্ঘকাল ধরে স্মাগলিঙ ব্যবসায় টিকে থাকতে পারতো না সে।

কে.জি.বি-র এমন একটা দলের প্রতিনিধিত্ব করছে কর্নেল রুস্তমভ, মাসুদ রানা যাদের চক্ষুশূল। অসহায় বন্দী অবস্থায় ওকে খুন করার সুযোগ পাওয়া যাবে, শোনামাত্র বিপুল উৎসাহের সাথে ছুটে আসবে তারা। আজকের দিনটা উৎসবে পরিণত হবে তাদের।

শক্ত ফাঁসটা চেপে বসেছে গলায়, রশির ঘষা লেগে ছড়ে গেছে চামড়া। গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে পিপাসায়। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে ওর, রক্ত চলাচল ক্ষীণ হয়ে আসায় গোড়ালি আর কব্জি দপদপ করছে। কেরোসিন কুপির শিখাটা কাঁপতে শুরু করলো। খানিক পর আবার স্থির হলো সেটা। হাজার বছরের পুরনো ভ্যাপসা গন্ধের সাথে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পোড়া কেরোসিনের গন্ধ।

কুপিটা সাদামাঠা টেবিলের ওপর, টেবিলের পাশের মেঝেতে পড়ে রয়েছে ডাচ জর্জ। তার মুখটা ডানে বা বাঁয়ে কাত হয়ে পড়েনি, আধ বোজা চোখ দুটো যেন আলোর সন্ধানে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের এক কোণ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে আছে সামান্য, যেন মরে গিয়েও অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনি সে, সাদা দাঁতের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে ভেতরে।

পকেট নাইফটার কথা মনে পড়লো রানার। বাক্স খোলার জন্যে ধার দিয়েছিল ওকে জর্জ। তার জাম্পসুটে কি ছুরিটা এখনো আছে? কিন্তু একটু নড়লেই যেখানে অসহ্য ব্যথা, জাম্পসুট থেকে

ওটা বের করবে কিভাবে?

জানে, চেষ্টা করার কোনো মানে হয় না।

তবু চেষ্টা করলো।

শরীর ঝাঁকিয়ে চেয়ারটাকে নাড়লো রানা। ফাঁসটা মাংসের ভেতরে ডেবে গেল, কামড়ে ধরলো শ্বাসনালী। গলার ভেতর দম আটকে যাওয়ায়, আকস্মিক আতংকের সাথে রানার মনে হলো, মারা যাচ্ছে সে। মনটাকে শান্ত রাখার জন্যে বার বার অটোসাজেশন দিলো নিজেকে। স্থির হয়ে আছে ও, ভয়ে নড়াচড়া করছে না। কিন্তু বাঁচার আকুতি আর জেদটা অসম্ভব বেড়ে গেছে। ব্যথা লাগবেই, সেটা সহ্য করে চেয়ারটাকে সরানো সম্ভব নয় কিছুতেই। কাজেই ব্যথা কম লাগার উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো রানা। একমাত্র সমাধান দিতে পারে আত্মসম্মোহন।

দুই কি তিন মিনিট গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলো রানা। শরীরটাকে ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে তুলতে পারলে ছুরিটা হয়তো হাতে পাওয়া সম্ভব। অবশ্য সেটা যদি জর্জের জাম্পসুটে এখনো থাকে।

চোখ মেললো, বড় করে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিলো। পুলকের সাথে অনুভব করলো, শ্বাস টানার সময় কোথাও কোনো ব্যথা অনুভব করেনি। প্রথমবার আস্তে করে শরীরটা ঝাঁকিয়ে সামান্য একটু সরালো চেয়ার। পরের বার আরো একটু জোরে। জাম্পসুট আর চেয়ারের মাঝখানে দূরত্বটা কমে এলো।

কিসের শব্দ হলো? স্থির হয়ে গেল রানা। কান পাতলো। বুট জুতোর শব্দ? নাকি কানের ভুল? দিনের আলো যদি ফুটেও থাকে, এই কামরা থেকে তা বোঝার কোনো উপায় আছে কি? কই,

কিছুই তো শুনতে পাচ্ছে না। আবার চেয়ারটা সরাতে গিয়ে ব্যথা পেলো রানা, বেরুবার পথ না পেয়ে গলায় আটকে গেল নিঃশ্বাস। বমি পেলো ওর।

মুখে ন্যাকড়া থাকায়, বমি হলে নির্ঘাত মারা যাবে রানা।

নিঃশ্বাস ফেলতে না পারায় শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় জমা হয়েছে, দপ দপ করছে খুলির ভেতরটা। যে-কোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে ও। কিন্তু আশাটা ত্যাগ করেনি এখনো। একবার যদি ছুরিটা হাতে আসতো!

আততায়ীরা আসবে, সচেতনভাবে শুধু এই একটা কথা চিন্তা করতে পারছে রানা। মনে মনে জানে, তারা এসে পৌঁছুবার আগে ওর পালাবার চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা নেই। তাই বলে হাল ছাড়তে রাজি নয়। আবার কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার চেষ্টা করলো ও। গলার পেশীতে ঢিল পড়ায় আটকে থাকা বাতাস ধীরে ধীরে বেরুতে শুরু করলো। সাবধানে শ্বাস নিলো রানা, থেমে থেমে। সারা শরীরে আরামদায়ক একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। খানিকক্ষণের মধ্যেই প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এলো শ্বাস-প্রশ্বাস।

বিশ্রামের সময় ইউরেনিয়ামের কথা মনে পড়লো ওর। অ্যারোনাফিস বললো, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কাজে ব্যবহারের জন্যে ইটালিতে পাঠানোর প্ল্যান ছিলো। কিন্তু রাশিয়ানদের কি বোকা বানাতে পেরেছে অ্যারোনাফিস? রাশিয়ানরা কি সত্যি বিশ্বাস করেছে, তাদের ইউরেনিয়াম ইটালিতে যাবে? বার বার চেক করে না দেখার কোনো কারণ নেই, বিশেষ করে জিনিসটা যখন ইউরেনিয়াম। একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারে রাশিয়ানদের সুখ্যাতি আছে। এর আগে তারা কখনো পশ্চিমা জগতে ইউরেনিয়াম বিক্রি করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি।

এবার তারা এতোই ব্যগ্র হয়ে উঠলো যে অ্যারোনাফিসের বানানো গল্পটা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনীয়তাটুকুও অনুভব করলো না? খোঁজ-খবর করা তেমন কঠিন কিছু নয়। চেষ্টা করলে অবশ্যই আসল তথ্য বেরিয়ে পড়তো।

নাকি ব্যাপারটা আসলে চোরের ওপর বাটপারি? ষড়যন্ত্রের ভেতর আরেকটা ষড়যন্ত্র নয়তো? শুধু সন্দেহ ও অনুমান, প্রমাণ করার জন্যে নিরেট কিছু নেই রানার।

পরিষ্কার ধারণা শুধু একটা ব্যাপারে আছে, রাশিয়া কোনো অবস্থাতেই চাইতে পারে না লিমবেরি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হোক।

অথচ, ইউরেনিয়াম ফিরে পাবার পর, দক্ষিণ দিকে রওনা হলো তারা, মনে হলো যেন লিমবেরির দিকেই ইউরেনিয়াম নিয়ে যাচ্ছে।

ধাঁধাটা এখানেই।

সমস্যাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো রানা।

নিজেকে প্রায় কোনো নোটিশ না দিয়েই, ঝোঁকের মাথায়, এক করা পা দুটোর সাহায্যে চেয়ার নিয়ে লাফ দিলো ও। ভয় ছিলো, চেয়ারটা পড়ে গেলে ফাঁসটা চারদিক থেকে চেপে বসে খুন করবে ওকে, রশিতে হ্যাঁচকা টান লাগলে ঘাড়টা ভেঙে যাবে।

চেয়ারের পায়াগুলো মেঝে থেকে শূন্যে উঠে পড়লো। চোখে সর্ষে ফুল দেখলো রানা। দুলতে শুরু করলো হলদেটে কামরা। চেয়ারটা থেমেছে, কিন্তু রানার প্রায় কোনো হুঁশ নেই। ইচ্ছে শক্তির জোরে ধীরে ধীরে পুরোপুরি সচেতনতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো ও।

বাতাস পাচ্ছে যেন সরু আর ভঙ্গুর একটা খড়ের ভেতর দিয়ে। শ্বাসনালীটা যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, মুখের ভেতর রক্তের লোনা স্বাদ।

অন্তত এখনো বেঁচে আছে ও।

হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকালো রানা। অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলো, ওর পায়ের আঙুল লাশটাকে ছুঁয়ে আছে। গন্তব্যে পৌঁচেছে ও, কিন্তু এরপর কি? চেয়ারের পিছন দিকে ঢিল করে দিলো শরীরটা, রশির টান টান ভাব যতোটা সম্ভব গলা থেকে শিথিল করার চেষ্টা করলো। তারপরও স্বস্তিকর লাগলো না। দাঁতের সারি দুটো পরস্পরের সাথে চেপে থাকায় টন টন করছে চোয়াল। হাত দুটোয় ব্যথার কোনো অনুভূতি নেই, অবশ হয়ে আছে।

জর্জের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘর-ঘর নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনছে রানা। মাথাটা ঘুরছে এখনো। বোকামি করায় কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে জর্জকে। এসপিওনাজ জগতে ভুলের মাশুল একটাই—জীবন, আগে বা পরে। সে কি জানতো না, তাকে ধরার জন্যে যে-কোনো দূরত্ব অতিক্রম করবে রানা। তবু, মনির হোসেন মারা গেছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানার জন্যে উইণ্ডমিলে যদি সে ফিরে না আসতো...

কিন্তু বোকার মতো ফিরলো সে।

তার আরেকটা বোকামি হলো অ্যারোনাফিসকে বিশ্বাস করা।

দূরে কোথাও একটা মোরগ ডাকলো, সেই সাথে বর্তমানে ফিরে এলো রানা। কামরার চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে দেখলো পুবদিকের একটা জানালার ফুটোয় ক্ষীণ আলোর আভাস। ভোর

হয়ে গেছে।

বোধ আর অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে রানার। নড়তে ইচ্ছে করছে না। গলার কাছে বমির ভাব আটকে আছে। দপ দপ করছে মাথা। আরো যেন অসুস্থ হয়ে পড়লে ভালো হয়, তাহলে জ্ঞান হারাবে।

মিলির কথা মনে পড়লো ওর, অ্যারোনাফিসের স্টাডিতে ছোট্ট কিন্তু মোহনীয় অভিনয় করেছে ওর সাথে। তারপর নিজের চারদিকে নির্লিপ্ততার একটা পাঁচিল তুলে দেয় মেয়েটা, অন্তত ওর বিরুদ্ধে।

যৌনাবেদনময়ীর ভূমিকা–নিশ্চয়ই তার একটা কারণ আছে। কেউ ভয় দেখালেই যথেষ্ট। কিংবা স্রেফ নির্দয়তা, অর্থাৎ বেঈমানী। অন্তত এটুকু পরিষ্কার যে অ্যারোনাফিসের সাথে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে মিলি। অন্য কিছু মনে হবার কারণ নেই।

গলায় বাতাস আটকে যাওয়ায় ব্যথা পেলো রানা, পানি বেরিয়ে এলো চোখের কোণে। কাশির একটা ঝোঁক দমন করলো, মুখভর্তি নোংরা ন্যাকড়া মুখের সমস্ত লালা শুষে নিয়েছে। ঘামের ফোঁটা জ্বালা ধরিয়ে দিলো চোখে। মনে হলো গোটা শরীর আগুনের মতো গরম হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ তো হলো। আর বেশি দেরি নেই। যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসবে খুনীরা।

চেয়ারটা দু'ফুট সরাতে কতোক্ষণ সময় নিয়েছে বলতে পারবে না রানা। প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছে ওকে, অসম্ভব ধকল গেছে শরীরটার ওপর, তারপরও পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। জর্জের মৃতদেহ পায়ের আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারছে বটে, কিন্তু হাত দিয়ে জাম্পসুটের নাগাল পাবে না। আবার, হাত দুটো মুক্ত করাও সম্ভব

নয়। জাম্পসুটের পকেট থেকে ছুরিটা বের করাই প্রধান সমস্যা। ছুরিটা আগে যেখানে রাখা ছিলো সেখানেই আছে কিনা তা-ও জানা নেই। তা যদি রাখা হয়ে থাকে, ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। নিচের দিকে তাকিয়ে পকেটটা দেখতে পাচ্ছে রানা। লাশের নিতম্বে সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে পকেটের মুখ।

বাইরে থেকে গরু বা ছাগলের গলায় বাঁধা ঘন্টার টুং টাং শব্দ ভেসে এলো। জানালার আরো কয়েকটা ফুটোয় ভোরের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জেগে উঠবে লিনডোস। অ্যারোনাফিস চাইবে তার আগেই রাশিয়ানরা যেন এখানে পৌঁছুতে পারে।

কুপির শিখাটা আবার কাঁপতে শুরু করলো। কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠলো কামরার বাতাস। সলতের পোড়া খানিকটা অংশ বাতাসে ভাসতে ভাসতে রানার পায়ের পাতায় পড়লো। নিভে গেল কুপিটা। সম্ভবত কেরোসিন শেষ হয়ে গেছে।

জানালার ফুটো দিয়ে চুইয়ে ঢোকা ভোরের অল্প আলোয় কামরাটা ঝাপসা লাগলো চোখে। চারদিকে গাঢ় ছায়া।

ছুরির নাগাল পেলেই বা কি হবে, অবশ হাত দুটো ওর নির্দেশ শুনবে কিনা কে জানে। বাঁধন কাটতে হলে ছুরিটা খুলতে হবে তো।

সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে, শুধু একটা কথা মাথায় ধরে রাখলো রানা। চেষ্টা করতে হবে। ঘাড় থেকে যে রশিটা গোড়ালিতে নেমে গেছে, সেই একই রশি দিয়ে ওর কব্জি বাঁধা হয়নি। গলায় ফাঁসের চাপ না বাড়িয়ে হাত দুটো নাড়াচাড়া করা সম্ভব। হাত দুটো মোচড়ালো রানা, বাঁধনগুলো ঢিল করা যায় কিনা দেখছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে ব্যথা, গোঙাচ্ছে, ফোঁপাচ্ছে। ইচ্ছে হলেও

ঢোক গিলতে পারছে না ও। ঘামে ভিজে গেছে গোটা শরীর। তারপরও যেমন বন্দী ছিলো তেমনি থাকলো ও, নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না।

ক্ষীণ একটা মাত্র আশা আছে।

চেয়ারটা যদি ঘুরিয়ে নেয় রানা, ওর পিঠ থাকবে জর্জের দিকে। পিছন দিকে ঝুঁকবে ও, এমনভাবে পিছন দিকে পড়বে যাতে হাত দুটো পকেটটার নাগাল পায়।

রশিতে টান পড়ায় ঘাড়টা মটকে যেতে পারে। ঘাড় যদি না-ও ভাঙে, ফাঁসটা এঁটে বসতে পারে গলায়, থেঁতলে দিতে পারে কণ্ঠনালী, বন্ধ হয়ে যেতে পারে বাতাস আসা-যাওয়ার সরু পথটা। কিংবা মেঝেতে সজোরে ঠুকে যেতে পারে মাথা, রাশিয়ানরা এসে দেখবে তাদের শিকার মরে বা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে।

তবে, কিছু যদি না-ও করে, মৃত্যু অবধারিত।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো রানা। কিছুই আসলে হারাবার নেই ওর।

প্রথমে চেয়ার ঘোরাবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, যাতে ওর পিঠ জর্জের দিকে আর হাত দুটো যতোটা সম্ভব পকেটটার সাথে একই লাইনে থাকে। কাজটার মাঝপথে রয়েছে রানা, সর্ষে ফুল দেখছে চোখে, বমি করছে নাক দিয়ে, ঠিক এইরকম সময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো ও।

আতংকের সাথে অনুভব করলো রানা, পিছন দিকে পড়ে যাচ্ছে চেয়ারটা। টেবিলটার সাথে সজোরে বাড়ি খেলো একটা কাঁধ, শরীরটা মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো, কাঁচের কুপিটা মেঝেতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো সশব্দে। জর্জের লাশের ওপর হালকাভাবে পড়লো রানা, মাথাটা ঠুকে গেল মেঝেতে।

আলোর একটা বিস্ফোরণ দেখতে পেলো রানা, ফাঁসটার পীড়ন অস্পষ্টভাবে টের পেলো গলায়। দুর্বল আঙুলগুলো জাম্পসুটের পকেট হাতড়াচ্ছে। কিছুই ঠেকলো না আঙুলের ডগায়।

ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি।

মুখের ভেতর কাপড়টা গলা বেয়ে নেমে যেতে চাইছে। বুকের খাঁচায় ছটফট করছে হৃৎপিণ্ড। অসহায় ভঙ্গিতে হাতের আঙুলগুলো বারবার গুটিয়ে আসছে।

থরথর করে কেঁপে উঠলো সারা শরীর। হাতের আঙুল খুলে গেল, টান টান হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

নেতিয়ে পড়লো রানা।

দূর থেকে ভেসে এলো দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ।

ঠাণ্ডা বাতাসের পরশটা অনুভব করলো রানা, কিন্তু শরীরটা নিজের কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না।

পায়ের আওয়াজটা ফাঁপা লাগলো কানে।

বেঁচে থাকার অনুভূতিটা শুধু মনের নিভৃত এক কোণে টিমটিম করে জ্বলছে। ওটার কোনো হিসেব জ্ঞান নেই, কিছুই মেলাতে পারে না, যৌক্তিকতা বোঝে না। শরীরটাই শুধু সচেতন, তা-ও পুরোপুরি নয়, মাঝে মধ্যে ছেদ পড়ছে। মৃত্যুর দিকে এতোটা কখনো তলিয়ে যায়নি ও।

আদিম একটা ভয় গ্রাস করলো ওকে, খাড়া হয়ে উঠলো লোমকূপ। কাকে ভয়, কিসের ভয়, জানে না। কোনো কারণ বা যুক্তি পরিষ্কার নয়, তবু ওর সচেতনতা প্রখর হয়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, চোখ না খুলেই দেখার চেষ্টা করলো সামনে কি আছে।

নড়াচড়া করায় টান পড়লো গলার ফাঁসে, এই প্রথম ব্যথাটা চিনতে পারলো রানা। মনে হলো কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, আসলে পেরিয়েছে কয়েকটা সেকেণ্ড, এই সময় চোখের পাতার উল্টাদিকটা ঝাপসাভাবে দেখতে পেলো ও। পাতার পাতলা চামড়া ভেদ করে ক্ষীণ আলো পড়েছে মণিতে।

বাতাসের অভাবে ফুসফুসে যেন আগুন জ্বলছে।

পায়ের শব্দ কাছে চলে এলো।

কে. জি. বি। অক্ষর তিনটে মনে পড়ে গেল রানার।

শিউরে উঠলো আতংকে।

'রানা? মাসুদ রানা?'

কে ডাকে? চোখের পাতা কেঁপে উঠলো রানার।

ধোঁয়াটে, ঝাপসা লাগলো সামনেটা। মানুষের একটা কাঠামো চিনতে পারলো ও। তারপর প্রায় পরিষ্কার দেখতে পেলো মিলিকে।

দ্রুত হাঁটু গেড়ে বসলো সে, মুখ থেকে টেনে বের করলো ন্যাকড়াটা। 'রানা?'

কথা বলার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু পারলো না। খানিকটা পিছিয়ে গেল মিলি, জটিল বাঁধনগুলো পরীক্ষা করলো। দু'সারি দাঁত ঘষলো রানা, চেহারায় দ্রুত বাঁধন খুলে দেয়ার মৌন আবেদন।

মিলির ব্যস্ত আঙুল কাজ শুরু করলো, প্রবল তাগাদায় হাত দুটো কাঁপছে। কিন্তু গিঁটগুলো শক্ত আর আঁট হয়ে গেছে, শুধু হাত দিয়ে খোলা সম্ভব নয়। রানা অনুভব করলো, আবার বেহুঁশ হয়ে পড়ছে। সচেতনতা ধরে রাখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো ও, চোখ ঘুরিয়ে কুপির ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকালো।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কাঁচের টুকরোগুলো দেখতে পেলো মিলি, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চোখ, ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো একটা। ঘাড় আর গোড়ালির মাঝখানে রশিটা কাটতে শুরু করলো সে। তার মাথা থেকে পর্দার মতো নেমে এসে মুখের একটা পাশ ঢেকে দিলো কালো চুল। আকস্মিক একটা টানের সাথে ঢিল পড়লো রশিতে, কৃতজ্ঞচিত্তে বেদনাকাতর ফুসফুসে সশব্দে বাতাস ভরলো রানা। নিঃসাড় শুয়ে থাকলো ও, শুধুই শ্বাস টানছে আর ফেলছে। বসে নেই মিলি, রানার হাত আর পায়ের বাঁধন কাটছে ব্যস্ততার সাথে।

গায়ের জোর খাটাতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ বেরিয়ে এলো মিলির গলা থেকে, রানার জ্যাকেটের কাঁধ ধরে টান দিলো সে, ওকে বসাবার চেষ্টা করলো।

'একটু পর,' হাসলো রানা, আচ্ছন্নবোধ করলো । ক্ষতবিক্ষত গলা থেকে আওয়াজটা বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ অচেনা, কর্কশ। 'দরজার দিকে লক্ষ্য রাখো।' পরিষ্কার হয়ে আসছে মাথাটা। লাফ দিয়ে দাঁড়ালো মিলি, হরিণীর ত্রস্ত পায়ে দরজার দিকে ছুটলো। পাশ ফিরে হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করলো রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা দূর করতে চাইলো।

'কেউ নেই,' ফিরে এসে বললো মিলি।

'তোমার একটা হাত দাও,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললো রানা, কাশির বেগটা দমন করতে পারলো না। কাশি থামার পর নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলো। ফুলে উঠেছে ওগুলো, কোথাও কালচে আবার কোথাও লালচে হয়ে উঠেছে।

জর্জের ওপর ঝুঁকে আড়ষ্ট হয়ে গেল মিলি।

'ওকে তুমি বাঁচাতে পারতে না,' বললো রানা। 'সে-চেষ্টা

করলে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনতে।'

'তোমার জন্যে ফিরে এসেছি আমি। চেষ্টা করেছি, কিন্তু আরো আগে আসার সুযোগ পাইনি।' রানার দিকে একটা হাত বাড়ালো মিলি।

হাতটা ধরে ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, পা দুটোকে মনে হলো লোহার পাত, গোড়ালির সাথে কব্জা দিয়ে আটকানো। শরীরের ভার পায়ের তলায় হাজারটা ছুরির কোপ মারলো যেন, যেন ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটছে ও। টলে উঠলো শরীরটা, পড়ে যাচ্ছে শেষ মুহূর্তে আবার সিধে হলো।

'তুমি সুস্থ নও, রানা!' উদ্বিগ্ন মিলি সতর্ক করে দিলো ওকে।

'কয়েক মিনিট সময় দাও।'

'এসো,' রানাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মিলি। 'শোও।'

'না!' পরমুহূর্তে নিজেকে শান্ত করলো রানা। 'না।' নিজেকে ছাড়ালো ও। 'সময় নেই, মিলি। আমাকে এক ঢোক পানি খাওয়াতে পারো?'

'পানি ? হ্যাঁ, পানি!' একটা দোরগোড়া টপকে ছুটলো মিলি, ভারি সবুজ পর্দাটা দুলছে। মুহূর্তের জন্যে। লালচে একটা কার্পেট, বিখ্যাত এক সিগারেট কোম্পানীর মোটাসোটা একটা পঞ্জিকা দেখতে পেলো রানা। একটা মগ হাতে ছুটে এলো মিলি, কিনারা থেকে পানি ছলকাচ্ছে। ঠাণ্ডা পানিতে গলার ভেতরটা আরাম লাগলো, লোভীর মতো ঢক ঢক করে মগটা খালি করে ফেললো রানা।

মিলি বললো,'আমি জানতাম, তোমাকে সাহায্য করতে হলে ভান করতে হবে আমাকে, যেন তোমার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। কোস্টাস যখন বললো রাশিয়ানদের জন্যে এখানে

রেখে যাবে তোমাকে, একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলাম।’

মগটা টেবিলে রেখে বড় করে শ্বাস টানলো রানা। ‘কিভাবে এলে?’ জানতে চাইলো ও।

‘গাড়িতে অসুস্থ হবার ভান করলাম,’ বললো মিলি। ‘ওর ধারণা, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আছি আমি, বিশ্রাম নিচ্ছি। গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়ার সময় বললো, মেয়েরা সত্যি দুর্বল।’

টেবিলের পাশে এক পা এক পা করে হাঁটলো রানা। তারপর দরজার দিকে ঘুরলো। গলার ভেতরে ও বাইরে এখনো ব্যথা করছে। ‘চলো, বেরিয়ে যাই এখান থেকে,’ নিচু গলায় বললো ও।

‘দাঁড়াও–তুমি বুঝতে পারছো না!’ রানার বুকে একটা হাত রাখলো মিলি। ‘মি. প্যাসিমভকেও আমাদের বাঁচাতে হবে।’

‘অবশ্যই। কিন্তু তার আগে নিজেদের বেঁচে থাকতে হবে।’ দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলো রানা। ঝট্ করে মাথাটা টেনে নিয়ে পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকালো, হতাশায় কালো হয়ে গেল চেহারা।

রানার চোখ আর চেহারা দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল মিলি। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলো সে, তারপর ফিসফিস করে জানতে চাইলো, ‘কে.জি.বি?’

ক্লান্তভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রানা।

আট

সরু গলি ধরে তিনজন আসছে ওরা, সবার আগে রয়েছে পরিশ্রমী চাষীর মতো দেখতে লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি। হাঁটার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কারো অবাঞ্ছিত দৃষ্টি আকৃষ্ট না করার নিয়মটা পালন করছে। প্রত্যেকের মাথায় স্ট্র হ্যাট, দ্বীপেই তৈরি হয়, দ্বীপবাসীদের অত্যন্ত প্রিয়। তিনজনের কাঁধে একটা করে ক্যামেরাও ঝুলছে।

ওদের বিশ্বাস করার কারণ আছে, পৌঁছুতে একটু দেরি হলেও পাওয়া যাবে রানাকে।

ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়েছে দু'চারজন বৃদ্ধ বা মহিলা, সমর্থ পুরুষরা সাগর থেকে ফিরে ঘুমাতে গেছে। জেলেদের মধ্যে যারা মাছ ধরে না, তাদের আয়-রোজগার নির্ভর করে ট্যুরিস্টদের ওপর। ট্যুরিস্টরা আসবে আরো অনেক বেলায়। রানার হাতঘড়িতে এখন মাত্র পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট।

ভোরের এই সময়টায় যা খুশি তাই করে নির্বিঘ্নে কেটে পড়ার সুযোগ আছে কে.জি.বি. এজেন্টদের। রাস্তায় কাউকে গুলি করাটাও তার মধ্যে পড়ে।

পায়ের তলায় এখনো পুরোপুরি সাড়া নেই রানার, অনেকটা

লাফানোর ভঙ্গিতে দ্রুত হাঁটলো ও, জর্জের লাশটা টপকালো, ঢুকলো কিচেনে, সেখান থেকে খিড়কি দরজা দিয়ে বাগানে।

ছোট্ট বাগান, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। করবী গাছের সরু আর নরম ডালের সাথে রক্তকরবী ঝুলছে। পাথুরে মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে তুঁতফল। মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। খেতের দিক থেকে ফসলের একটা গন্ধ ভেসে আসছে।

রানাকে ধরে ফেললো মিলি। 'না, রানা!' হাঁপাচ্ছে সে। 'পালিয়ো না!'

'কি হলো তোমার ?' রানা হতভম্ব।

'মি. প্যাসিমভ...ওকে আমাদের সাহায্য করতে হবে!'

মেয়েটার শরীর ও মন, দুটোর ওপর দিয়েই প্রচণ্ড ধকল গেছে। কোন্ কাজের কি গুরুত্ব বুঝতে পারছে না বেচারি। রানা চিৎকার করতে চাইলেও, আহত গলা বাধা দিলো ওকে, 'কিন্তু তিনি তো এখানে নেই!'

'না, তবে...'

'তাহলে আমাদের কথা আগে আসে।'

রঙচটা কাঠের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলো রানা, ফুলে ওঠা হাত দুটোর নার্ভ ঝাঁকি লাগলে প্রতিবার প্রতিবাদ করছে।

পিছন থেকে রানার শার্টের আস্তিন খামচে ধরলো মিলি, রাগের সাথে টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো রানা। মেয়েটার আচরণ দেখে মনে হলো বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

বাড়িটা গ্রামের কিনারায়, রানার সামনে বেঢপ আকৃতির পাথরের স্তূপ, কাঁটাঝোপের আড়ালে পাথুরে পাঁচিল, নিঃসঙ্গ জলপাই গাছ সহ পাহাড়ের খাড়া কাঁধ ছাড়া আর কিছু নেই। পাহাড়ের মাথায় দুর্গ, প্রাচীন কীর্তির স্বাক্ষর।

শিশির ভেজা ঢাল। বাতাসে ফুলের সুগন্ধ। কখনো ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে রানা। ব্যথাটা অনুভব করে খুশি হয়ে উঠলো ওর মন, অনুভূতি ফিরে আসছে পায়ে, জোর পাচ্ছে ভর দেয়ার সময়। উঠে আসছে মিলি, নধর নিতম্ব প্রতিটি ঝাঁকির সাথে নারীসুলভ দোল খাচ্ছে। এদিকে মানুষজনের কোনো চিহ্ন নেই। নিচে সেন্ট পল'স বে, সাগর ওখানে নীল প্রজাপতির ডানার মতো ঝলমলে। মাথার ওপর, একদম কাছে, ঝুলে রয়েছে দুর্গটা।

উপসাগর আর পাহাড়চূড়ার মাঝখানে সরলরেখার মতো ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামটা। আবার ওপর দিকে দৃষ্টি তুলে উঠতে শুরু করলো রানা।

এই সময় অনেক নিচ থেকে ভেসে আসা একটা চিৎকার ঢুকলো ওর কানে। বুঝলো, ওদেরকে দেখে ফেলেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকালো রানা, ঠাণ্ডা বাতাসেও দর দর করে ঘামছে ও। ইতিমধ্যে যথেষ্ট ওপরে উঠে এসেছে ওরা, নিচের লাল টালি দিয়ে ছাওয়া বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে বাড়িগুলোর সামনের রাস্তাটা। তিনটে মূর্তি ছিটকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে যাবে ওরা, শুরু হবে ধাওয়া।

কয়েক গজ পিছন থেকে ফুঁপিয়ে উঠে কি যেন বললো মিলি, তার লম্বা কালো চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

'এক মিনিটের মধ্যে পিছনে চলে আসবে ওরা,' সতর্ক করলো রানা, গলার স্বরে উত্তেজনা।

'রানা...তোমার কাছে পিস্তল নেই?'

'জানোই তো নেই।'

খাড়া ঢাল, কোমর ভাঁজ করে নিচের দিকে ঝুঁকে উঠে যাচ্ছে রানা। শরীরটা আগের চেয়ে অনেক সুস্থ লাগছে। দ্রুত ফিরে আসছে শক্তি। শুধু গলাটা ব্যথা করছে এখনো। দুর্গের গোড়ায় গাছপালা একটা পাঁচিল তৈরি করেছে। ওটার পিছনে যদি যেতে পারতো ওরা…।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে তাকালো রানা। সাদা চুনকাম করা বাড়িগুলো রোদ লেগে চক চক করছে, ব্যথা করে উঠলো চোখ।

বাগানের গেট বিস্ফোরিত হলো, বেরিয়ে এলো লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি।

পিস্তলের গুলি হলো, শব্দগুলো ভোঁতা লাগলো কানে। সরে গিয়ে একটা জলপাই গাছের আড়ালে দাঁড়ালো ও, মিলির জন্যে অপেক্ষা করলো, নাগালের মধ্যে পেয়ে হ্যাঁচকা টানে আড়ালে নিয়ে এলো তাকে।

'আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মিলি। 'তুমি যদি ফিরে যাও…।'

দু'হাতে তাকে ধরে ঝাঁকালো রানা। 'তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে মুক্ত করেছো একদল হাঙরের মুখে তুলে দেয়ার জন্যে?'

'তোমাকে আমি কখন থেকে বলার চেষ্টা করছি, মি. প্যাসিমভ একটা চুক্তি করতে চান…।'

'তুমি থামবে, ফর গডস সেক?'

পাহাড় বেয়ে ছুটে আসছে জাগোরস্কি, ঘন ঘন হোঁচট খাচ্ছে সে, গাল পাড়ছে, লাল মুখটা হিংস্র পশুর মতো। বাকি দু'জনকে বাগানের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখলো রানা।

ওপর দিকে তাকিয়ে দুর্গের গোড়া আর গাছগুলোর দূরত্ব অনুমান করার চেষ্টা করলো ও। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ গজ হবে। দীর্ঘ, বিপজ্জনক পঞ্চাশ গজ। বিপদের মাত্রা কয়েকশো গুণ বেড়ে যেতে পারে মিলি যদি বোঝা হয়ে দাঁড়ায় বা অসহযোগিতা করে।

রানাকে দ্রুত ওপর দিকে তাকাতে দেখে মিলিও শক্ত করলো মনটা। ক্লান্ত সে, কিন্তু এখনো নেতিয়ে পড়েনি। নিঃশ্বাস ফেলছে কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। সাদা স্ল্যাকস হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে গেছে, রোদে পোড়া তামাটে নরম চামড়া ছড়ে গেছে।

'এক ছুটে উঠতে হবে, মিলি,' বললো রানা। 'পারবে?'

'কিন্তু ওদের কাছে পিস্তল রয়েছে!'

'এঁকেবেঁকে দৌড়াবে।'

'কি লাভ, রানা? পালানো সম্ভব নয়, যদি না...।'

তাকে থামিয়ে দিলো রানা, 'ওপরে নিশ্চয়ই লুকোবার কোনো জায়গা পাবো।'

রানার ওপর স্থির হয়ে থাকলো মিলির দৃষ্টি, চোখ জোড়া বিস্ফোরিত। 'তুমি ছুটলে ওরা তোমাকে গুলি করে মারবে।'

'ধরতে পারলেও মারবে,' ধৈর্য হারিয়ে হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে ঝাঁকালো রানা। তারপর, মিলিকে অগ্রাহ্য করে, লাফ দিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটলো। আলগা পাথরে বারবার পিছলে গেল পা, কাঁটাঝোপে ঘষা খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হলো গোড়ালি। রানার পিছু নিতে দেরি করেনি মিলি।

আকাশ যেন স্বচ্ছ নীল লেন্স, রোদের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে প্রখর করে তুলেছে, গোটা পাহাড়ী এলাকা যেন আগুনের শিখায় পরিণত হবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। তবু ধূসর ঘাসে এখনো কিছুটা শিশির লেগে রয়েছে। ডানা ঝাপটে একটা বাজপাখি উড়ে এলো,

মাথার ওপর স্থির হলো এক মুহূর্তের জন্যে, দিক বদলে চলে গেল বাঁ দিকে।

রানার চোখের কোণে আরো কি যেন একটা ধরা পড়লো।

নিচে, কে.জি.বি. এজেন্টদের বাম দিকে, গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হলো আরো দু'জন লোক, পাহাড় ঘুরে আরেক দিকে ছুটছে তারা, রানাকে যেন সামনের দিক থেকে বাধা দেয়ার ইচ্ছে।

রানা ছুটছে। আপাতত পিস্তলের কোনো শব্দ নেই। সাইডআর্ম-এর জন্যে দূরত্ব একটু বেশি হয়ে যায়, জাগোরস্কি তার অ্যামুনিশন অপব্যয় করছে না। শিখা আকৃতির সাইপ্রেস গাছগুলোকে ছাড়িয়ে এলো রানা, ঘন ছায়ার ওপর ধপাস করে বসে পড়লো। কয়েক সেকেণ্ড পর হোঁচট খেতে খেতে পৌঁছুলো মিলি, প্রায় আছাড় খেয়ে পড়লো রানার পাশে, সশব্দে বাতাস টানছে।

দুর্গ প্রাচীরের গোড়ায় বিপুল আবর্জনা দেখা গেল। বোল্ডার তো আছেই, তার সাথে রয়েছে বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ, গাছের শুকনো ডালপালা, খসে পড়া পাঁচিল—যতোদূর দৃষ্টি চলে। সেদিকে তাকিয়ে রানা বললো, 'ওদিকে যাবো আমরা, টানেল বা গুহা কিছু একটা পেয়ে যেতে পারি।'

'যতো যাই করো, ওদের হাতে ধরা দিতে হবে আমাদের,' হতাশ সুরে বললো মিলি।

'রানা…,' হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করে রানার জ্যাকেটের সামনেটা খামচে ধরলো মিলি। '…তুমি যদি মি. প্যাসিমভের কথা নিয়ে ওদের কাছে যাও, গিয়ে বলো যে তুমি জানো কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে…তোমাকে রেহাই দেয়ার বিনিময়ে তাঁর কাছে ওদেরকে নিয়ে যেতে রাজি আছো…।'

‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?’ রেগে গিয়ে বললো রানা। ‘ভেবেছো ওরা কথা রাখবে?’

‘এখনো তিনি কোস্টাসের ইয়টে আছেন,’ বললো মিলি, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি।

‘ঠিক জানো তুমি?’ জানা দরকার রানার।

‘আমার কথা শুনবে তুমি?’ ফিরে যাবে? ওদের সাথে কথা বলে দেখবে?’ ব্যাকুল চোখে রানার দিকে তাকালো মিলি।

‘তুমি ভাবতে পারলে, ওদেরকে আমি তাঁর কাছে নিয়ে যাবো?’ ঠোঁটের কোণে ঘামের স্বাদ পেলো রানা। বাতাসে দারুচিনি আর সাগরের লোনা গন্ধ। ট্যুরিস্টরা আসতে শুরু করলে, চিন্তা করলো রানা, কে.জি.বি. এজেন্টরা সাবধান হয়ে যাবে। তখন একটা সুযোগ পাবে ও। ততোক্ষণ লুকিয়ে থাকার মতো একটা জায়গা পেলে হতো।

‘রানা, আমার কথা শোনো…।’

‘তুমি যাও, যা খুশি বলো ওদেরকে।’

‘আমার কথায় ওরা গুরুত্ব দেবে না। অন্তত তোমাকে খুন করার আগে নয়।’

‘প্যাসিমভের ব্যাপারটা কি বলো তো? তিনি কি জানেন না, তাঁকে নিয়ে অ্যারোনাফিস রাশিয়ানদের সাথে ব্যবসা করতে চাইছে?’

‘এমনও তো হতে পারে, রাশিয়ানরা রাজি হলো না। সেক্ষেত্রে আমেরিকানদের সাথে ব্যবসা করার চেষ্টা করবে কোস্টাস। কিন্তু আমি জানি, রানা, মি. প্যাসিমভ নিজের দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। কোস্টাসকেও তিনি বিশ্বাস করেন না, বলেছেন আমাকে। সেজন্যেই তো ভয় পাচ্ছি, কখন না কি

ঘটে যায়।' রানার আরো কাছে সরে এলো মিলি, ওর দু'চোখে উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা। 'তিনি মহৎ ব্যক্তি, রানা। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। একটা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি, পারমাণবিক দুঃস্বপ্ন থেকে চিরকালের জন্যে দুনিয়ার মানুষকে মুক্তি দিতে চান। কিন্তু, সবার ওপরে স্বদেশ, এ-কথা বারবার আমাকে বলেছেন। দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসেন তিনি। আমি কথা দিয়েছি, সম্ভাব্য সব রকমভাবে সাহায্য করবো তাঁকে।'

তিক্ত হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'তুমি জানো না কিসের সাথে জড়াতে চাইছো নিজেকে। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, বেশিরভাগই তা সত্যি নয়। এসপিওনাজ মানে হলো প্যাঁচের ভেতর প্যাঁচ, ষড়যন্ত্রের ভেতর ষড়যন্ত্র। প্রফেশনালরাই তল পায় না।'

'পরিষ্কার করে কথা বলতে পারো না?' মিলির গলায় ঝাঁঝ।

'আমেরিকা আর রাশিয়ার সম্পর্কটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মিলি। ওদের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হলে বিপদ নেমে আসবে গোটা দুনিয়ার ওপর।'

'কিছুই বুঝলাম না।'

'ভুল করার কোনো অবকাশ নেই,' বললো রানা। 'কোথাও একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, সেটা ব্যর্থ করতে হবে আমাকে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, দুনিয়াটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পড়েছে একা তোমার কাঁধে?' মিলির কণ্ঠে শ্লেষ।

'নতুন করে নয়, সেটাই আমার পেশা, বৃহত্তর অর্থে।'

গান গেয়ে এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যাচ্ছে পাখির ঝাঁক।

আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না, উপলব্ধি করলো রানা।

পিছনের সঙ্গী দু'জন জাগোরস্কির সাথে মিলিত হয়েছে, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো ও। নিচের জলপাই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে তারা, মুখ তুলে সাইপ্রেস গাছগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে। পিস্তলগুলো হাতে, রোদ লেগে চক চক করছে ব্যারেল।

ডানে-বাঁয়ে তাকালো রানা। দ্বিতীয় দলটাকে দেখলো না কোথাও। পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা। তলপেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো উদ্বেগে।

হাত দুটো ফুলে আছে এখনো, তবে অনুভূতি ফিরে আসায় পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছে। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে ছুটে আসায় আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে পায়ে, এখন আর আগের মতো ভারি লাগছে না। তাজা বাতাস পেয়ে ফুসফুসও স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে।

রাশিয়ানরা সরাসরি ওকে লক্ষ্য করে উঠে আসছে।

মিলির হাত ধরে সিধে হলো রানা, পাথরের স্তূপ লক্ষ্য করে ছুটলো। পাহাড়টা পাথুরে হলেও, দুর্গটা এই পাহাড়ের পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়নি। ভাঙা পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে ছুটছে ওরা, আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলে এলো পাহাড়ের আরেক দিকের কিনারায়। অনেক নিচে একটা অ্যাম্ফি থিয়েটার দেখা গেল। গভীর একটা ডোবায় টাইগার লিলি ফুটে রয়েছে। মরা, শুকনো ঝোপের একটা স্তূপ পেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো রানা।

'কি?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো মিলি।

'কি যেন একটা আছে ওখানে।'

পড়ে থাকা শাখা-প্রশাখা ডিঙিয়ে ফিরে এলো রানা, শ্যাওলাভরা পানির ক্ষীণ একটা ধারা দেখতে পেলো। পাইন গাছের মাটি ছোঁয়া শাখাগুলোকে ব্যস্ত হাতে সরালো ও, পাথরের

গায়ে অন্ধকার একটা ফাটল দেখতে পেলো। পাঁচিলটার দু'দিকে তাকালো ও, কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে আঙুল বাঁকা করে মিলিকে কাছে আসার ইঙ্গিত দিলো। ডালপালা টপকে দ্রুত চলে এলো মিলি, তাকে ধরে মৃদু ধাক্কা দিলো রানা, ঢুকিয়ে দিলো সরু ফাটলের ভেতর। নিজেও ঢুকলো।

ছোট্ট পরিসর, পাশাপাশি দু'জন দাঁড়াবার পর ভেতরে আর জায়গা নেই। মাথার ওপর ডানা ঝাপটাচ্ছে একদল বাদুড়, কর্কশ আওয়াজ করছে। উৎকট একটা গন্ধ ঢুকলো নাকে। পাঁচিল চুইয়ে গাঢ় রঙের পানি বেরুচ্ছে, অস্পষ্ট আলোয় পানির রেখাগুলোকে সাপের মতো কিলবিল করতে দেখলো ওরা। ফাটলটার মেঝে স্যাঁতসেঁতে, ক্রমশ উঁচু হয়ে ওপরদিকে উঠে গেছে। রানা আশা করেছিল, পথটা ওপরের দুর্গ পর্যন্ত চলে গেছে, কিন্তু তা যায়নি। দশ কি বারো ফুট এগিয়ে থেমে গেছে, পাথর-ধসের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে সরু টানেলটা।

মুখ থেকে মাকড়সার জাল সরালো রানা, সতর্ক চোখে তাকিয়ে থাকলো ডাল আর পাতায় ঢাকা ফাটলটার মুখের দিকে।

'এখানে বিশ্রাম নিতে পারো,' মিলিকে বললো রানা। 'লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছি আমরা।'

'ওদের চোখে ধরা পড়ে গেলে, বেরুবার কোনো পথ নেই।'

কথা না বলে ফাটলের মুখে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'এখনো কিন্তু ওদের সাথে কথা বলা যায়,' বললো মিলি।

এবারও রানা কিছু বললো না।

'মি. প্যাসিমভ আমাকে বলেছেন, তিনি জানেন, তুমি যদি তাঁকে রাশিয়ানদের কাছে পৌঁছে দাও, ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে।'

রানা যেন মিলির কথা শুনছে না।

'তোমার হয়ে সুপারিশ করবেন তিনি।'

'তাঁর নিজের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।'

'রানা, আমি চাই না তুমি মারা যাও!' আবেগ আর মানসিক যন্ত্রণা উথলে উঠলো মিলির কথায়।

'তুমি মারা যাও, আমিও তা চাই না,' বললো রানা। 'কর্নেল রুস্তমভ আমাকে খুন করার পর তোমাকে ছেড়ে দেবে না।'

'সে-ঝুঁকি নিয়েই তো তোমার কাছে এসেছি আমি। তবে মি. প্যাসিমভকে সাহায্য করতে হবে, তাঁকে তুলে দিতে হবে রাশিয়ানদের হাতে।'

'সময় হলে। তার আগে নয়। তোমার মতো আমিও মি. প্যাসিমভের ভালো চাই। তোমাকে কথা দিচ্ছি, তাঁকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার বা রাশিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশে পাঠিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

রানার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো মিলি। 'সবই আমি বিশ্বাস করি, ডার্লিং। তবু, এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, একমাত্র আমি যেভাবে বলছি সেভাবেই বাঁচতে পারো তুমি। বাঁচতে হলে, নিকোলাইকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে তোমার। কোনো অবস্থাতেই আমেরিকায় তাকে পাঠানো যাবে না।'

'তোমার বুঝি ধারণা, আমি আমেরিকানদের চর?'

মিলি চুপ করে থাকলো।

তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকালো রানা। 'কি ব্যাপার বলো তো? একবার মি. প্যাসিমভ, একবার শুধু নিকোলাই? আসলে কি ঘটেছে, জানতে পারি?'

হতচকিত দেখালো মিলিকে। 'জানি না। তাঁ...তাঁর ব্যাপারে

একেকবার একেক রকম অনুভূতি হয় আমার।’

‘আরো অনেক কিছুই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো তুমি।’ মিলির হাত দুটো গলা থেকে নামালো রানা। ‘প্যাসিমভ তোমাকে একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। তোমার মতো দু’একটা মেয়েকে আগেও আমি এরকম বিহ্বল হতে দেখেছি। ভালো কথা, তাঁকে তুমি জর্জের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে কি মনে করে?’

‘জর্জ আমাকে বললো, মি. প্যাসিমভ যা চাইবেন তাই করবে এইচআরসি। তবে, সেই সাথে জানালো, এইচআরসি-র সাথে যোগাযোগ করার জন্যে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তাকে। আমেরিকা ও রাশিয়া, দু’পক্ষই তাকে চায়, কাজেই রক্তারক্তি কাণ্ড বাধতে পারে–সেজন্যেই আমরা গা ঢাকা দিলাম। কিন্তু জর্জ আমাকে সরিয়ে দিলো। এতো ভয় পাই আমি যে কোস্টাসকে কিছু জানাবার সাহস হয়নি।’ মিলির চোখে আবেদন। ‘আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো না?’

‘করি, কিংবা হয়তো করি না। মি. প্যাসিমভের সাথে এতো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ো তুমি যে তাঁর ভেতর যদি খারাপ কিছু থাকেও, তোমার দেখতে পাবার কথা নয়। মি. প্যাসিমভ বা তুমি পছন্দ করো বা না করো, আমার কাজ আমাকে করতে হবে, মিলি। কে.জি.বি-র হাতে মি. প্যাসিমভকে আমি তুলে দিচ্ছি না। অন্তত এখুনি নয়।’

রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মিলি, ওর বুকে দমাদম ঘুসি মারলো। তাকে সরিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলো রানা, দু’জোড়া হাত প্যাঁচ খেয়ে গেল, রানাকে ল্যাং মারলো মিলি। তাকে নিয়েই সরু টানেলের মেঝেতে পড়লো রানা। অনুভব করলো, ওর চোখ লক্ষ্য করে থাবা মারলো মিলি। মাথা সরিয়ে নিয়ে একটা হাঁটু

বাড়িয়ে দিলো মিলির পেট লক্ষ্য করে, ফুঁপিয়ে উঠলো মিলি। পরমুহূর্তে সমস্ত ভার নিয়ে তার কোমল শরীরে চেপে বসলো রানা। ওর নিচে মোচড় খাচ্ছে মিলি, ছটফট করছে, ফোঁপাচ্ছে। আওয়াজটা আতংকিত করে তুললো রানাকে, জানে বাইরে কাছে পিঠে কোথাও পৌঁছে গেছে কে.জি.বি. এজেন্টরা।

তারপর, অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হলো রানার। সবিস্ময়ে অনুভব করলো, দীর্ঘ ও ক্ষুধার্ত চুম্বন। রানার ঘাড়টা দু'হাতে আলিঙ্গন করলো মিলি, ওর মুখে উত্তপ্ত ও সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। ঝোঁকের মাথায় নয়, কিংবা ভাবাবেগেও নয়, নয় শারীরিক চাহিদার কাছে পরাজিত হয়ে, মিলির আকস্মিক পরিবর্তনের প্রতি স্রেফ সমর্থন জানিয়ে পাল্টা চুমো খেলো ও।

রানার পাল্টা চুমো যেন পাগল করে তুললো মিলিকে। শরীরটা গুটিয়ে রানার ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইলো সে, আনন্দের আতিশয্যে অনবরত গোঙালো। মধু আর বুনোফুলের সুগন্ধ পেলো সে। তার লম্বা কালো চুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল দুটো মুখ। রানার গলায় চেপে বসলো জোড়া হাতের বাঁধন, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সাথে ফুলে ফুলে উঠছে ব্লাউজ ঢাকা বুক। 'ডার্লিং,' গুঙিয়ে উঠলো সে। 'ডার্লিং, এখানে নয়।'

'কানাগলির বিড়াল হতে চাও না?'

'কথা দিলে বিশ্বাস করবে পরে?'

মনে মনে হাসলো রানা।

রানার নিচে শুয়ে থাকলো মিলি, এক চুল নড়ছে না, ভয়ংকর লোভনীয়।

তারপর রানার মুখে একটা আঙুল বুলালো সে। 'আমি চাই ব্যাপারটা সুন্দর ভাবে ঘটুক, শান্ত নিরিবিলি আরামদায়ক

পরিবেশে।'

'প্রশ্ন হলো, তোমার গ্রীক দেবতারা আমাদের ভাগ্যে অন্য কোনো সময় বরাদ্দ করবেন কিনা,' থমথমে গলায় বললো রানা।

'করবে, তুমি দেখো। শুধু তুমি যদি যুক্তি মানো।'

উঠে বসলো রানা। 'ফের সেই এক কথা?'

'আমি তোমার প্রাণ বঁাচিয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠলো মিলি, চোখ দুটো জ্বলছে।

'যাতে মি. প্যাসিমভ আর তুমি আমাকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারো?' সাথে সাথে জবাব দিলো রানা। 'সেটা না হয় বোঝা যায়, কিন্তু ভাবিনি তুমি আমাকে এভাবে ঘুষ দিয়ে বশ করার চেষ্টা করবে। এ-ধরনের মেয়েকে কি বলা হয়, জানো? শেষ পর্যন্ত তুমি শরীরটাকে টোপ বানালে?'

লাফ দিয়ে সিধে হলো মিলি, টানেলের মুখ লক্ষ্য করে ছুটলো।

'মিলি, ফিরে এসো!' চেঁচিয়ে ডাকলো রানা।

কিন্তু এরইমধ্যে টানেল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে মিলি। ফাটলের মুখ লক্ষ্য করে ছুটলো রানা, ফাঁকটার কাছে আসতেই ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। রাশিয়ানদের একজনকে বিশগজ দূরে রেখে তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে মিলি। সচকিত লোকটা চরকির মতো আধপাক ঘুরলো, পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করলো, এক সেকেণ্ড সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করলো ছুটন্ত মূর্তিটার দিকে।

গুলির শব্দ শুনে শিউরে উঠলো রানা।

নয়

কে.জি.বি. এজেন্টের মাথাটা ঝাঁকি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে পড়লো, খুলির অর্ধেক উড়ে গেছে। মাথার ওপর ঝুলে থাকা রক্তিম ঊষারাগের নিচে আছাড় খেয়ে পড়লো সে। অবিশ্বাস ভরা দীর্ঘ একটি মুহূর্ত, একচুল না নড়ে তাকিয়ে থাকলো রানা।

ত্রস্তা হরিণীর মতো পাহাড় বেয়ে গ্রামের দিকে নেমে যাচ্ছে মিলি।

গুলির আরো শব্দ হলো, খোলা জায়গায় ফাঁপা লাগলো কানে।

কে.জি.বি. এজেন্টের লাশ আর মিলিকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। টানেল থেকে বেরিয়ে এলো ও, সতর্কতার সাথে গাছের ডালপালা সরিয়ে নিঃশব্দে এগোলো। বৃক্ষ সারির গোড়ার কাছে পড়ে আছে লাশটা—লোকটা আরো একটু ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেলে কি ঘটতো ভাবতে চাইলো না রানা। লাশের পাশেই পড়ে রয়েছে নাইন এম এম ম্যাকারভ। সেটা তুলে নিয়ে পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে সামনে তাকালো ও। বাতাস আর পাখিদের কলরব ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, সাগরের চারশো ফুট ওপরে উত্তপ্ত ঢালটাকে গ্রাস করে রেখেছে অনিশ্চিত আশংকা

আর নিস্তব্ধতা।

ডান দিকে গুলির শব্দ হলো। মাথা নামিয়ে স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে গেল রানা, কিন্তু তার আগেই ওর মাথার অনেক ওপরে পাথরে লাগলো বুলেট। ঝট্ করে সেদিকে মুখ তুলেই দেখতে পেলো, দুর্গের পাঁচিল থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে এলো পিস্তল বাগিয়ে ধরা একটা হাত।

দুর্গে কে বা কারা রয়েছে জানে না রানা, কে.জি.বি. এজেন্টদের গুলি করছে দেখে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাবারও বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলো না। মাথা নিচু করে লাশটা টপকালো ও, শরীরের প্রতিটি লোমকূপ সতর্ক, ছুটলো সরু একটা নালা লক্ষ্য করে। শুকনো নালা, পাড় দুটো সামান্য উঁচু, বৃক্ষ সারি ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা নিচে নেমে এলো ও।

একটা বোল্ডারের আড়ালে কুঁজো হয়ে রয়েছে লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি। বুলেট আকৃষ্ট করার জন্যে আড়াল থেকে খানিকটা বেরিয়ে এলো সে। ওদিকে তৃতীয় লোকটা আরেক ঢাল বেয়ে দুর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে ওপরের অচেনা সশস্ত্র প্রতিপক্ষকে কাবু করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

নিজের পিস্তল সিধে করলো রানা, দাঁড়ালো, চিৎকার করলো, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও, লেফটেন্যান্ট!'

ঘুরেই গুলি করলো জাগোরস্কি, তার লম্বাটে মুখ ঘৃণায় টান টান হয়ে আছে। রানার কানে ছ্যাঁকা দিয়ে, বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। কিছু বিবেচনা করার সময় নয় এটা, রানাকে গুলি করতে হবে সরাসরি খুন করার জন্যে। অন্য কেউ হলে ঠিক তাই করতো। ওর হাতে গর্জে উঠলো পিস্তলটা, ঝাঁকি খেয়ে পাথুরে ঢালে নিতম্ব দিয়ে পড়লো লেফটেন্যান্ট। চোখ-মুখ খিঁচিয়ে

গাল দিলো সে, রানার বুলেট তার ঊরুর খানিকটা মাংস উড়িয়ে নিয়ে গেছে। গাল পাড়তে পাড়তে আবার রানার দিকে অস্ত্র ঘোরাতে চেষ্টা করলো সে। এবারও রানা খুন করার জন্যে নয়, শান্তভাবে লক্ষ্য স্থির করলো আহত করার জন্যে। রানার দিকে ঘুরছে জাগোরস্কির পিস্তল ধরা হাত, পিস্তল সহ কব্জিটা ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল। পরমুহূর্তে হাতটা মুখের সামনে তুলে কেঁদে উঠলো লেফটেন্যান্ট। পিস্তলটা তো হাতে নেই-ই, ডান হাতে আঙুল বলতেও কিছু অবশিষ্ট নেই তার।

ওপরের ঢাল থেকে দৃশ্যটা পুরোপুরিই চাক্ষুষ করলো জাগোরস্কির সর্বশেষ সঙ্গী, কালবিলম্ব না করে ঘুরলো সে, ঢাল বেয়ে ছুটলো গ্রামের দিকে।

ম্যাকারভটা বেল্টে গুঁজে মাথা তুলে দুর্গের দিকে তাকালো রানা।

'মাসুদ ভাই, আপনি?'

দুর্গপ্রাচীরের কিনারায় চন্দনের উদ্ভাসিত মুখ।

'কে পাঠালো তোমাদের?' জানতে চাইলো রানা।

'আমরা ওদেরকে অনুসরণ করছিলাম। কাল রাত থেকে।' নিজের বাঁ দিকে তাকালো চন্দন, আবার রানার দিকে ফিরলো। 'আমার সাথে সাযযাদ রয়েছে।' পরমুহূর্তে তার পাশে উদয় হলো সিরিয়াস একটা চেহারা, যেন অধ্যবসায়ী ছাত্র।

পাঁচিলের মাথায় উঠলো ওরা, আছাড়ি-পাছাড়ি করে দুর্গের বাইরে নেমে এলো। কাছে এসে সাযযাদ বললো, 'মাসুদ ভাই, আমরা সম্ভবত অ্যাসাইনমেন্টটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, তাই না?'

'কিন্তু মেয়েটাকে ওদের হাতে পড়তেই বা দিই কিভাবে?' অজুহাত দেখানোর সুরে বললো চন্দন, রানার দিকে ফিরলো। 'মাসুদ ভাই, আপনি…?'

'আমি ভালো, শুধু দু'এক জায়গার চামড়া কেটে গেছে।' রানার চেহারা অস্বাভাবিক গম্ভীর। কঠিন সুরে জানতে চাইলো ও, 'তোমরা খুন করার জন্যে সরাসরি গুলি করলে কেন? কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে?'

দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলো ওরা, কথা বললো চন্দন, 'মাসুদ ভাই, বন থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা…।'

'কি মেসেজ?' হঠাৎ খেয়াল হতে সাযযাদের দিকে ফিরলো রানা। 'ওদিকে, বোল্ডারের আড়ালে সরে গেছে আহত লোকটা, লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি। তার অবস্থা কি দেখো, যদি সম্ভব হয় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে, হাত দুটো তো বাঁধবেই। তারপর গ্রামে নেমে লক্ষ্য করো অপর লোকটা কোন্ দিকে যায়।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই,' তারকা-র হুকুম পেয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে ছুটলো ফ্যান।

'ঢাকা থেকে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল,' সাযযাদ চলে যেতে শুরু করলো চন্দন সরকার। 'সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গত বছর বিক্রি বা দান না করার নীতি নির্ধারণের পর থেকে আজ পর্যন্ত এক ছটাক ইউরেনিয়ামও বিদেশে কোথাও পাঠানো হয়নি…।'

'ইন্টারেস্টিং।'

'ঢাকাকে আরো জানানো হয়েছে, প্রখ্যাত কোনো রুশ বিজ্ঞানীর দেশত্যাগ সম্পর্কেও মস্কোর কিছু জানা নেই। কর্মকর্তা

ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, কে.জি.বি-র কথিত ভূমিকা সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

'এ-সব কথা মেসেজে বলার পর সোহেল ভাই ধারণা দিয়েছেন, সম্ভবত কে.জি.বি-র একটা গ্রুপ কর্তৃপক্ষ বা সরকারকে কিছুই না জানিয়ে সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। তা যদি হয়, নিজেদের অপরাধের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে এলোপাতাড়ি খুন করতেও দ্বিধা করবে না ওরা। কাজেই তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যে-কোনো মূল্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে...'

ব্যাখ্যাটায় সন্তুষ্ট হলো না রানা, যদিও বুঝলো, এ-সব নিয়ে আলোচনা করার সময় এখন নয়। 'শোনো, নিকোলাই প্যাসিমভ কোস্টাস অ্যারোনাফিসের কাছে আছেন, বা ছিলেন। কিছু সুবিধে আদায়ের বিনিময়ে প্যাসিমভকে কে.জি.বি-র হাতে তুলে দেবে সে, বা দিতে পারে। কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে চাই না প্যাসিমভ কে.জি.বি-র হাতে পড়ুন।'

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো সাযযাদ। 'মাসুদ ভাই, লেফটেন্যান্ট পালিয়েছে। রক্তের দাগ দেখে বুঝলাম, গ্রামের দিকে নেমে গেছে সে।'

'নাঈমকে নিয়ে যতোটুকু পারো করো তুমি,' তাকে নির্দেশ দিলো রানা। 'আশপাশেই তো আছে সে, তাই না?' ফিরলো চন্দনের দিকে। 'তুমি আমার সাথে এসো। অ্যারোনাফিসের ইয়টে হানা দিতে হবে।' পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ও।

ঢালের নিচে সবার আগে নামলো সাযযাদ, গাড়িতে উঠে স্টার্ট

দিলো সে, কে.জি.বি. এজেন্টদের খোঁজে রওনা হয়ে গেল ঝড়ের বেগে। চারদিকে তাকিয়ে কোনো ট্যাক্সি দেখতে না পেয়ে একটা ফিয়াটের দিকে এগোলো রানা। পিছন থেকে প্রশ্নবোধক স্বরে চন্দন বললো, 'মাসুদ ভাই?'

'চুরি বিদ্যা বড় বিদা, যদি না পড়ো ধরা,' বলে ফিয়াটের হাতল ধরে টান দিলো রানা, খুলে গেল দরজা।

ট্যুরিস্টদের প্রথম দলটা পৌঁছে গেছে, যদিও এইমাত্র সকাল হলো। লিনডোসের বাইরে রাস্তাটা এখনো প্রায় ফাঁকাই বলা যায়।

কোস্টাল রোড ধরে উত্তর দিকে ছুটলো ফিয়াট, কাল রাতের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করলো রানা।

'দুর্যোগবহুল রাত,' স্বীকার করলো চন্দন। 'কিন্তু, মাসুদ ভাই, মেয়েটার কি ব্যাপার বলুন তো?'

'তাকে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার সময় নেই আমাদের। নিজের ভালো নিজেই বুঝুক।'

'খারাপ আরো কিছু খবর আছে, মাসুদ ভাই,' বললো চন্দন। 'নেমিসিসে যে বীকনটা রেখে এসেছিলাম, সেটা সাড়া দিচ্ছে না।'

রানার চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'তারমানে কে.জি.বি. এজেন্টরা ওটা খুঁজে পেয়েছে।'

'আরো একটা দুঃসংবাদ, মাসুদ ভাই,' বললো চন্দন। 'রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখা অবিশ্বাস্য একটা রুশ মেসেজ হাত করেছে। সোভিয়েত দূতাবাস থেকে মস্কোয় যাচ্ছিলো মেসেজটা। তাতে বলা হয়েছে, ইউরেনিয়াম নিয়ে নিরাপদে রওনা হয়ে গেছে নেমিসিস লিমবেরির পথে।'

'গোটা ব্যাপারটা উদ্ভট!' হুইলের ওপর চাপড় মারলো রানা।

‘সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাশ্য নীতির সাথে ব্যাপারটা একদম মেলে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কেন তারা উইপন-গ্রেড ইউরেনিয়াম দিতে যাবে? লিমবেরির সরকারী বাহিনী গেরিলাদের সাথে যুদ্ধ করছে, আর গেরিলাদের সাহায্য করছে রাশিয়া। লিমবেরি সরকারের হাতে পারমাণবিক বোমা থাকলে আফ্রিকাকে তারা নো ম্যানস ল্যাণ্ড করে ছাড়বে।’

‘এমনও তো হতে পারে, মাসুদ ভাই,’ বললো চন্দন, ‘ইউরেনিয়াম আসলে গেরিলারা পাবে?’

‘বোকার মতো কথা বলছো!’ ধমক দিলো রানা। ‘সরকারী বাহিনীর সাথে ওখানে যারা যুদ্ধ করছে তাদের না আছে ভালো কোনো ঘাঁটি, না আছে প্রযুক্তি। অস্ত্র বলতে তাদের হাতে অটোমেটিক রাইফেল আর গ্রেনেডই সম্বল। ইউরেনিয়াম ওরা ধুয়ে খাবে?’

‘তাহলে তো…।’

‘যেভাবে হোক থামাতে হবে নেমিসিসকে,’ প্রতিজ্ঞার সুরে বললো রানা।

‘কিন্তু কিভাবে?’ ব্যাকুল প্রশ্ন চন্দনের।

নুড়ি ছড়ানো সৈকতে স্ট্র হ্যাট পরা একজন বোটবিল্ডারকে পাশ কাটালো ওরা, ছোটো ডিঙি নৌকায় তক্তা লাগাচ্ছে।

‘জাহাজটা কোথায় তা-ও আমরা জানি না,’ আবার বললো চন্দন। ‘যদি এয়ার সার্চের ব্যবস্থা করতে পারতাম, খড়ের গাদায় পিন খোঁজার মতো হতো ব্যাপারটা।’ সাগরের দিকে একটা হাত বাড়ালো সে। ‘মার্চেন্ট ট্রাফিকে গিজ গিজ করছে ঈজিয়ান, কোন্ জাহাজটা নেমিসিস?’

সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, হুইল ধরা আঙুলের গিঁটগুলো সাদা, চোখ ভরা জরুরি তাগাদার ভাব। প্রবল বাতাস বইতে শুরু করেছে, আকাশ নীল—জ্বলজ্বল করছে, মাটি আগুন হয়ে আছে রোদে। 'কে.জি.বি. শুরু থেকেই জানতো কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে ইউরেনিয়াম,' বললো ও। 'গন্তব্য ইটালি, এ-কথা বলে অ্যারোনাফিস বোকার মতো ভেবেছিল তাদেরকে ধোঁকা দিতে পেরেছে সে।'

চন্দনের গলায় অবিশ্বাস, 'ইউরেনিয়ামটা হাইজ্যাক করে অ্যারোনাফিস সব এলোমেলো করে না দিলে, নিকোলাই প্যাসিমভ এতোক্ষণে লিমবেরিতে থাকতেন!'

'দারুণ একটা কথা বলেছো।' ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো রানার। 'কিন্তু কে.জি.বি. যদি জানতোই যে নেমিসিস ইটালিতে ভিড়বে না, যদি জানতো যে জাহাজটা দক্ষিণ অর্থাৎ লিমবেরির দিকে যাবে, তাহলে তো তাদের কাছে গোটা ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগারই কথা—ক্যানেলে তারা নেমিসিসে উঠলো কেন?'

'নিকোলাই প্যাসিমভকে আটক করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাই,' বললো চন্দন, যেন কিছু চিন্তা না করেই।

'কিন্তু তা যদি না হয়?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই?'

'যদি এমন হয়,' বললো রানা, 'জাহাজে চড়ে যা করেছে তারা, ঠিক সেটা করারই উদ্দেশ্য ছিলো তাদের? জাহাজ ঘুরিয়ে নেয়া, ইউরেনিয়াম ফেরত পাওয়া, তারপর আবার লিমবেরির দিকে রওনা হওয়া?'

'কিন্তু নিকোলাই প্যাসিমভকে তাদের দরকার ছিলো।'

'ছিলো না, তা আমি বলিনি। কিন্তু জাহাজ থেকে তাঁকে তারা

নামায়নি, তাদের জায়গায় আমি হলে ওটাই আমার প্রথম কাজ হতো।'

'তাঁর পিছু নিয়ে এখানে এসেছে তারা,' বললো চন্দন।

'হ্যাঁ, তিনি কিডন্যাপ হবার পর। তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে নেমিসিস থেকে। আই রিপিট, নিকোলাই প্যাসিমভকে তাদের দরকার ছিলো না, এ-কথা আমি বলছি না। কিন্তু কোথায় তাঁকে দরকার ছিলো? রাশিয়ার মাটিতে, নাকি নেমিসিসের ডেকে?'

'মাসুদ ভাই, ভদ্রলোককে গোপনে নেমিসিসে তুলে দেয়া হয়েছিল।'

'ওরকম যাতে দেখায়, সে-আয়োজন করা ওদের পক্ষে সম্ভব।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে চন্দন বললো, 'ঠিক আছে, জাহাজটা দখল করার উদ্দেশ্যে যদি ফিরে গিয়ে ইউরেনিয়াম উদ্ধার করা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ...।' চুপ করে গেল সে, ঝট করে রানার দিকে ফিরলো।

'ঠিক ধরেছো তুমি, চন্দন,' বললো রানা। 'কেউ তাদেরকে নিশ্চয়ই জানায় যে জাহাজ থেকে ইউরেনিয়াম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেই কেউ-টা নির্ঘাত জাহাজেই ছিলো, ধরে নেয়া চলে। তার সাথে রেডিও ট্র্যান্সমিটার না থেকেও পারে না।' এক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে আবার বললো ও, 'যদি বলি খোদ নিকোলাই প্যাসিমভই সেই লোক?'

সাগর ছুঁয়ে ছুটে আসা বাতাসে লোনা গন্ধ। ঢেউগুলোর মাথায় সাদা ফেনার মাত্রা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। রাস্তার অপর দিকে, মাঠের ওপর বুনো ফুলের ঝোপগুলো নুয়ে পড়ছে বাতাসের চাপে।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর কথা বললো চন্দন, গলায় সন্দেহ নিয়ে, ‘কিন্তু, মাসুদ ভাই, কে.জি.বি.-র কোনো অন্যায় পরিকল্পনায় নিকোলাই প্যাসিমভের মতো ব্যক্তিত্ব কি অংশগ্রহণ করবেন? জানি, তিনি বলেছেন দেশে ফিরে যেতে চান। কিন্তু তিনি কি…?’

‘এডওয়ার্ড গ্রীন, প্যাসিমভের ওপর যে নজর রাখছিল, তাকে হাতে পেলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতো। কিন্তু মারা গেছে সে। কি জানি,’ বললো রানা, ‘তদন্ত করে দেখতে হবে।’

মানড্রাকি হারবারে এক মিনিট দেরি করে পৌঁছুলো ওরা।

গ্যাঙওয়ে ধরে অ্যারোনাফিসের ইয়টে উঠে যাচ্ছে মিলি, দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো রানা। ইতিমধ্যে নোঙর তুলে ফেলা হয়েছে, রওনা হবার জন্যে সর্বশেষ লাইনটাও টেনে নেয়া হলো। সজোরে ব্রেক কষে থামলো ফিয়াট, দরজা খোলার সময় দেখলো ও, গর্বিত ভঙ্গিতে হারবার ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ইয়টটা, ঢেউগুলো কালো খোলের দু’দিকে আছড়ে পড়ছে।

‘মেয়েটা এখানে কি করছে, মাসুদ ভাই?’ সবিস্ময়ে জানতে চাইলো চন্দন।

‘প্যাসিমভের পাশে দাঁড়িয়েছে? নিজের বিশ্বাসের প্রতি অনড়? কে জানে!’

গাড়ির পাশে, প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, অসহায় চোখে দেখলো সেন্ট নিকোলাস দুর্গটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অ্যারোনাফিসের ইয়ট। কারো কিছু করার নেই।

লালচে গোঁফের প্রান্ত ধরে মোচড় দিলো চন্দন, তারপর হাত

দুটো ট্রাউজারের দুই পকেটে ভরে টান টান হলো। ‘এখন কি হবে, মাসুদ ভাই? কি করবো আমরা?’ পকেটের ভেতর হাত দুটো ঘন ঘন মুঠো পাকালো সে। ‘কোস্টাস অ্যারোনাফিস পালিয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে তা-ও আমরা জানি না…।’

‘একটা কাজই করার আছে আমাদের,’ বললো রানা, তাকিয়ে আছে খানিকটা দূরে নোঙর করা সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারের ঝলমলে বোটটার দিকে। ‘এসো।’

নামমাত্র বিকিনি পরা একটা মেয়ে ডেক চেয়ারে লম্বা হয়ে ঘুমাচ্ছে। ইয়টের কোনো ক্রুকে আশপাশে দেখা গেল না। মেয়েটার নগ্ন কাঁধ ছুঁলো রানা। চোখ মেলে তাকালো সে, ধীরে ধীরে হাসি ফুটলো মুখে। ‘আমি কি স্বপ্ন দেখছি?’ রানার আপাদমস্তকে চোখ বুলালো।

‘স্বপ্নটা ভেঙে দেয়ার জন্যে দুঃখিত,’ সবিনয়ে বললো রানা। ‘তোমাকে ইয়ট থেকে নেমে যেতে হবে।’

বেদিং ট্রাংক পরা প্রকাণ্ডদেহী, পেশীবহুল এক যুবককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে দু’কোমরে হাত রেখে রানার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো সে, ফরাসী ভাষায় জানতে চাইলো, ‘কি ঘটছে এখানে?’

‘তোমাদের দু’জনকেই বোট থেকে নেমে যেতে হবে, মঁশিয়ে,’ একই ভাষায় জবাব দিলো রানা।

‘আমরা মি. বারকেইনহেইমারের অতিথি…।’

‘আমি জানি। প্লিজ, তাড়াতাড়ি নেমে যান। সময় খুব কম।’

রানার দিকে কঠিন চোখে তাকালো যুবক, তারপর মেয়েটার দিকে ফিরলো। ‘ওর কথায় কান দিয়ো না। মি.

বারকেইনহেইমারের সাথে কথা বলছি আমি।' ঘুরলো সে, কয়েক পা এগিয়ে থামলো, ফিরে এলো রানার সামনে। 'আমার বান্ধবীকে যদি বিরক্ত করো, ফিরে এসে তোমার চোখ দুটো তুলে নেবো–মনে থাকে যেন।'

রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝট করে কাত হলো ও, দড়াম করে ঘুসি মারলো যুবকের পেটে। প্রথমে সামনে ঝুঁকলো যুবক, তারপর চিবুকে রানার হাঁটুর প্রচণ্ড এক গুঁতো খেয়ে রেলিং টপকে ইয়টের বাইরে চলে গেল, ডেক থেকে পা দুটো শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেয়ে ঝপাৎ করে শব্দ হলো একটা। এক মুহূর্ত দেরি না করে ডেক চেয়ার ছাড়লো মেয়েটা, গ্যাংওয়ে ধরে এক ছুটে নেমে গেল।

রানার দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসলো চন্দন।

'চলো, ইয়টের মালিকের সাথে কথা বলি।'

সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারকে পাওয়া গেল সেলুনে, ফল আর পেস্ট্রি নিয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছেন। সোনালি, নীল আর সাদা কার্পেটে লাল জ্যাকেট পরে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাটেনড্যান্ট। 'মি. রানা!' কাঁটাচামচ মুখের কাছে স্থির হয়ে গেল, তাতে একটা কড়ে আঙুল সাইজের আঙুর। 'আপনি কি…মানে, তিনি কি…?'

'এখনো না, মি. বারকেইনহেইমার।'

টেবিলের আরেক দিকে সরে গেল চন্দন, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'অত্যন্ত দুঃখজনক,' নাক টেনে বললেন বারকেইনহেইমার। চামচটা নামিয়ে রাখলেন প্লেটে। সিল্কের শার্ট পরে আছেন

ভদ্রলোক, সাদার ওপর সাদা ডোরাকাটা। স্ল্যাকস জোড়া নীল কর্ডের, পায়ে মোজাহীন লিনেন ডেক শু। 'আমার বিশ্বাস, আপনি এখনো সেই উদ্ভট ধারণা পোষণ করেন যে কিডন্যাপিঙের সাথে জর্জ জড়িত; সেজন্যেই আপনার দ্বারা কিছু হচ্ছে না,' অভিযোগের সুরে বললেন তিনি। আঙুরটা মুখে পুরলেন এবার।

'কে বললো আমার দ্বারা কিছু হচ্ছে না, মি. বারকেইনহেইমার? ডাচ জর্জ মারা গেছে, আপনি শোনেননি?'

বিষম খেলেন এইচআরসি কর্মকর্তা, তাঁর নীল চোখ একজোড়া মার্বেলের মতো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। লাফ দিয়ে সিধে হলেন তিনি, দাঁড়িয়ে থাকলেন রানার চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে, বয়সের ভাঁজ পড়া মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

ঠাণ্ডা গলা রানার, 'আপনার ইয়টটা আমার দরকার। ক্রুদের তীরে নামতে বলুন, প্লিজ।'

'আপনি, স্যার, বদ্ধ উন্মাদ! ডাচ জর্জ? মারা গেছে? সর্বনাশের তাহলে আর কিছু বাকি রাখেননি। কিভাবে···?'

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই।'

'সময় করুন তাহলে, শুনতে পাচ্ছেন? আমার বোট কি জন্যে দরকার আপনার?'

'কোস্টাস অ্যারোনাফিসকে ধরতে হবে।'

'কোস্টাস অ্যারোনাফিস! তাকে ধরবেন? আপনি? পাগল না হলে এ-কথা বলতেন না! জানেন, কোস্টাস অ্যারোনাফিস কাদের সাথে ওঠাবসা করে, তার ওজন কতো?'

'জানি। আপনাদের সমাজের লোকেরা পুলিশ চীফকে ডিনারে ডেকে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু আমরা যার সম্পর্কে আলাপ করছি তার অপরাধ ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করা নয়।

আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে, এইমাত্র এই হারবার ছেড়ে নিকোলাই প্যাসিমভকে নিয়ে পালিয়েছে কোস্টাস অ্যারোনাফিস।'

'এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না,' ঈষৎ রাগতঃকণ্ঠে বললেন বারকেইনহেইমার।

'আপনার বিশ্বাস করার দরকার নেই। আপনি তো আরো অনেককিছু অবিশ্বাস করছেন। ইয়ট ছেড়ে তাড়াতাড়ি নেমে যান, ক্রুদেরও সাথে নিন।'

'এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে, মি. রানা! বেয়াদপির জন্যে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে আপনাকে। আপনি আমাকে এখনও চেনেন না...।'

'ওর পা দুটো ধরো, চন্দন,' এইচআরসি কর্মকর্তার পিছনে চলে গেল রানা, তাঁর বগলের নিচে হাত ঢোকালো। ধরাধরি করে সেলুন থেকে বের করে আনা হলো তাঁকে, গ্যাংওয়ে বেয়ে নামিয়ে আনা হলো ইয়ট থেকে। বারকেইনহেইমার ধস্তাধস্তি করলেন না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা।

খর্বকায় চীনা ওয়েটারকে কিছুই বলতে হলো না, লক্ষ্মী ছেলের মতো সে তার মালিককে অনুসরণ করে নেমে গেল ইয়ট থেকে। ইয়টে ফিরে এসে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক তুলে নিলো রানা, মুখের ওপর রোদ যেন জ্বলন্ত হাতুড়ির বাড়ি মারছে। চন্দনকে নোঙর তোলার নির্দেশ দিলো ও। এক ছুটে চলে এলো ব্রিজ সুপারস্ট্রাকচারে।

ক্যাপটেনকে তার কেবিনে পাওয়া গেল, হুইলহাউসের ঠিক পিছনে। বয়স বেশি নয়, খোশমেজাজী একটা ভাব আছে চেহারায়, সম্ভবত ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করে না। ইন্টারকমের সাহায্যে কুক আর ক্রুদের ডাকতে বললো রানা, অনুরোধের সুরে। রানার বেল্টের পিছনে গুঁজে রাখা ম্যাকারভটার দিকে বার দুয়েক

তাকিয়ে ইন্টারকমের সুইচে চাপ দিলো সে।

ওরা অপেক্ষা করছে, একশো ফুটি জলযানের ভোলভো ডিজেলগুলোকে চালু করার নির্দেশ দিলো রানা। ইয়টের পেটের ভেতর থেকে এঞ্জিনের ভোঁতা গুঞ্জন ভেসে আসছে, এক এক করে কুক আর ক্রুরা জড়ো হলো। ইতিমধ্যে জেটি থেকে রওনা হয়ে গেছে ইয়ট, ব্রোঞ্জের তৈরি জোড়া হরিণের দিকে এগোচ্ছে ওরা। সবাইকে নিয়ে নিচের ডেকে নেমে এলো চন্দন, লাইফবোটে সবার শেষে উঠলো ক্যাপটেন। তীরের দিকে ফিরে যাচ্ছে লাইফবোট।

ফ্লাইং ব্রিজে উঠে এলো চন্দন, দ্বীপের সৈকতকে পাশ কাটাচ্ছে ইয়ট। হুইলে হাত রেখে একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। তবে কালো ইয়টটা প্রথমে চন্দনই দেখতে পেলো। প্রখর রোদে কালো একটা খুদে কাঠামো, দক্ষিণ-পুব দিকে চকচক করছে।

সাগর আর বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো তার গলা, 'খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে ব্যাটা, মাসুদ ভাই।'

কোর্স সামান্য একটু অ্যাডজাস্ট করলো রানা। 'দ্বীপের আরেক দিকে যাবার জন্যে তার হয়তো শুধু খোলা সাগর দরকার খানিকটা। উত্তর-পশ্চিম অর্থাৎ এথেন্সের দিকে বাঁক নেয়ার উপায় নেই, যতোক্ষণ না কেপ প্রাসোনিসি ঘুরতে পারে।'

'কিন্তু যদি তার সাথে নিকোলাই প্যাসিমভ না থাকেন?'

'মিলির ধারণা, আছেন। আর যদি না-ই থাকেন সাযযাদ আর নাঈমের ওপর ভরসা করতে হবে আমাদের। কে.জি.বি-র যারা তীরে রয়েছে তাদের ওপর নজর রাখছে ওরা।' এক সেকেণ্ড চুপ থাকার পর আবার বললো ও, 'তবে আমার বিশ্বাস, প্যাসিমভ অ্যারোনাফিসের সাথেই আছেন।'

কালো ইয়টটা চওড়া আর ভারি, বারকেইনহেইমারের ইয়টের মতো দ্রুতগতি নয়। প্রথম দিকে মাঝখানের দূরত্ব কমতে শুরু করলো। তারপর অ্যারোনাফিস বুঝতে পারলো, তার পিছু নেয়া হয়েছে। কালো ইয়টের গতি বেড়ে গেল, দূরত্ব কমার মাত্রা সেই সাথে পরিবর্তিত হলো, তবে কমছে।

'ওটাকে আমরা ওভারটেক করবো,' বললো চন্দন, মুখ থেকে লবণ মুছলো সে।

'এখনো অ্যারোনাফিস খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে,' বিস্ময়ের সাথে বললো রানা।

'লোকটাকে হাতে পাবার পর কি করা হবে, সেটাই হলো প্রশ্ন,' বললো চন্দন।

উত্তাল ঢেউ সাগরে, ইয়টের খোলে ভেঙে পড়ছে একের পর এক পানির পাহাড়, ব্রিজের ডেকে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা। ঢেউয়ের মাথা সাপের ফণার মতো ছোবল মারছে রেলিং আর ডেকের ওপর, নাচানাচি করছে ব্রিজের চারদিকে। চোখ রগড়ে সামনের দিকে তাকালো রানা। অ্যারোনাফিসের ইয়ট আর মাত্র একশো গজ দূরে। ফ্লাইং ব্রিজে কেউ নেই, খালি।

ডান দিকে তাকালো রানা, কুঁজো-পিঠ দ্বীপের পাহাড়গুলোকে দেখতে পেলো, লবণাক্ত বাতাসে খানিকটা অস্পষ্ট। পাহাড়গুলো গাঢ় লাগছে, দু'পাশে সবুজ উপত্যকা। মাথার ওপর ঘোলাটে আকাশ, পাহাড়ের চূড়ায় জমতে শুরু করেছে কালো মেঘ।

ওর সামনের উইণ্ডশীল্ড মাকড়সার জাল হয়ে গেল, গুলির কোনো শব্দ শোনেনি ও।

হোলস্টার থেকে একটা ম্যাগনাম ·৩৫৭ রিভলভার বের

করলো চন্দন। সেটা দেখে কে.জি.বি. এজেন্টের উড়ে যাওয়া খুলির কথা মনে পড়ে গেল রানার, বিস্মিত হওয়ার কিছু দেখলো না।

'হোল্ড ইট,' বললো ও।

রানার দিকে ফিরলো চন্দন। আলিঙ্গন করে আছে কন্ট্রোল প্যানেলকে, সামনের দিকে ঝুঁকে, রিভলভারটা ধরে আছে দু'হাতে।

'টার্গেট না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' বললো রানা।

'হুইল হাউসটা ড্রিল করতে পারি।'

'কিন্তু আমরা যতোদূর জানি, ওখানে প্যাসিমভ আছেন,' মনে করিয়ে দিলো রানা।

'অবশ্য মেয়েটাও আছে…।'

রানার এক পলকের দৃষ্টিতে তিরস্কার। 'তার কথা ভেবে আমরা দ্বিধা করবো না।'

আরেকটা বুলেট রাডার মাস্টের ছাল তুলে নিয়ে গেল, রানার পিছনে। 'ওই, ওদিকে রয়েছে!' একটা হাত তুলে লোকটাকে দেখালো ও, আফডারডেকের ওপর পাটাতনের ফাঁকের চারধারে নিচু একটা বেড রয়েছে, বেডের কিনারা থেকে উঁকি দিলো লোকটা, চুল উড়ছে বাতাসে।

·৩৭৫ ম্যগনামের বিস্ফোরণের শব্দ ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাতাস। চোখে ধরা পড়ে এমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। লোকটা এখনো রয়েছে ওখানে।

ইতিমধ্যে দুটো ইয়টের দূরত্ব আরো কমে গেছে। পঞ্চাশ গজের মতো ব্যবধান রেখে ফুলস্পীডে ছুটছে ওরা। প্রতি মুহূর্তে

খোলের গায়ে আছাড় খাচ্ছে ঢেউ, পানির ছিটে স্থায়ী পর্দার মতো ঝুলে রয়েছে সেলুনের জানালা আর রেলিঙের সামনে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলার মতো আরেকটা গুলির শব্দ হলো।

সাগরের পানিতে সারা শরীর ভিজে গেল রানার। ইয়ট যেভাবে দোল খাচ্ছে, ভয় পাবার তেমন কোনো কারণ নেই, পিস্তলের গুলি লাগার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আগুনের ঝলকটা অকস্মাৎ দেখতে পেলো রানা। তার সাথে ধোঁয়া। আতংকের সাথে উপলব্ধি করলো ও, একটা বাজুকা ছোঁড়া হয়েছে। স্টারবোর্ড থেকে বিশ ফুট দূরে অগ্নিশিখা আর পানির বিশাল স্তম্ভ দেখা গেল। পায়ের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো ডেক । তারপর ভেসে এলো বিস্ফোরণের আওয়াজ।

হুইল ধরে ঝুলে পড়লো রানা। আরেকটা বুলেট উইণ্ডশীল্ডে এসে লাগলো। তবে অ্যামুনিশন অপব্যয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না একে। গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন, দূরত্ব আরো কমে গেছে।

আফটারডেকে দুজন লোককে দেখা গেল, মাথা আর পিঠ বাঁকা করে বাজুকা রি-লোড করছে। যতোটা সম্ভব লক্ষ্যস্থির করলো চন্দন। একটা বাল্কহেড থেকে রঙ চটালো তার বুলেট, লোক দু'জন ঝট করে মুখ তুলে তাকালো। পরমুহূর্তে আবার বাজুকার দিকে নিচু হলো তারা।

ব্যবধান মাত্র পঁচিশ গজ।

লঞ্চিং টিউবটা কাঁধে নিলো একজন। ফুলস্পীডে থ্রটল রাখলো রানা, সামনের ইয়টের সমান করা পানিপথ ধরে ছুটছে এইচআরসি-র ইয়ট। আবার গুলি করলো চন্দন, এবারও ব্যর্থ

হলো। ঠোঁট কামড়ে, ভুরু কুঁচকে রিভলভারের দিকে তাকালো সে।

হুশ-শ্ আওয়াজের সাথে ছুটে এলো রকেট, এতো কাছে যে গতিপথটা এবার চোখ দিয়ে অনুসরণ করা গেল না। বিস্ফোরণের শব্দটা হতে প্রায় কোনো সময় নিলো না। লাফিয়ে উঠলো ডেক, রানার পায়ের তলা অবশ হয়ে গেল।

'টার্গেট মিস করেনি ওরা!' চিৎকার করলো চন্দন।

'আমাদের সুযোগ আসছে,' বললো রানা। ওর মনে হলো, মেইন সেলুনে ঢুকে গেছে রকেটটা, বিস্ফোরিত হয়েছে ভেতরে। তা যদি হয়, খোলের কোনো ক্ষতি হবার আশংকা নেই। দূরত্ব এতো কমে গেছে যে কালো ইয়টটার আফটারডেক ওয়েলটা দেখতে পাচ্ছে রানা। চন্দন আবার গুলি করলো। এবার দু'জন লোকের একজন চরকির মতো পাক খেয়ে ইয়টের কিনারা থেকে ছিটকে পড়লো, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে। অপর লোকটা দৌড় দিলো। অকস্মাৎ অ্যারোনাফিসের ইয়ট পাগলামি শুরু করলো।

কালো ইয়টের হেলমসম্যান হঠাৎ দিক বদলে পিছনের ইয়টকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলো। প্রথমে ডান দিকে কাত হয়ে পড়লো তারা, তারপর বাম দিকে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে হেলমসম্যান।

'চন্দন, সাবধান...ব্রেস ইওরসেলফ!'

পরমুহূর্তে সংঘর্ষ। কাঠ আর ইস্পাতের ঘর্ষণে কান-ফাটানো শব্দ হলো। ধোপা যেভাবে কাঠের তক্তার ওপর ভিজে কাপড় আছাড় মারে, হুইলের ওপর ঠিক সেভাবে আছাড় খেলো রানা।

হুইল থেকে ড্রপ খেয়ে কন্ট্রোল প্যানেলে পড়লো ও, চামড়া উঠে গেল হাঁটু থেকে, নেতিয়ে পড়লো ডেকের ওপর। মাত্র এক মুহূর্ত, তারপর ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে লাফ দিতে চেষ্টা করলো ও, দেখলো নাকে রক্ত নিয়ে টলতে টলতে সিধে হবার চেষ্টা করছে চন্দন। কালো ইয়টের পিছনটা প্রবল ঝাঁকি খেতে খেতে নিচের দিকে ডেবে যাচ্ছে, প্রকাণ্ড একটা চকচকে ছোরার মতো বারকেইনহেইমারের ইয়ট চড়াও হয়েছে সেটার ওপর।

বাতাসের সাথে ভেসে এলো আর্তনাদ আর নির্দেশের শব্দ।

ব্রিজের চারদিকে ছুটোছুটি করছে বুলেট। সেলুনের মাথা থেকে অ্যারোনাফিসের দু'জন লোক গুলি করছে, দেখতে পেলো রানা। কালো ইয়টের একটা প্রপেলার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এইচআরসি বো-প্লেটের ধাক্কায়, নিরেট ইস্পাতের আর্তনাদে রী রী করে উঠলো গা।

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো রানা, পিছু হটতে শুরু করলো বোট। দুটো জাহাজ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলো, এই ফাঁকে ·৩৫৭ দিয়ে গুলি করলো চন্দন। কালো ইয়ট কাত হয়ে রয়েছে একদিকে, পিছনে মস্ত ক্ষত হয়ে গেছে। পাক খেতে শুরু করলো সেটা। ইতিমধ্যে মাথার ওপর চলে এসেছে কালো মেঘ, দ্বীপের ওপর তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। দ্বীপের সৈকত থেকে এদিকে চলে আসছে ফোঁটাগুলো।

ফুল অ্যাহেড-এ থ্রটল দিয়ে হুইলটা বন বন করে ঘোরালো রানা। ক্ষতিগ্রস্ত বো-র ভোঁতা নাক কালো ইয়টের তৈরি করা বৃত্তটাকে ভেদ করে যাবে।

'আবার ধাক্কা দেবেন?' বিস্ফারিত চোখ নিয়ে চিৎকার করলো

চন্দন, তার রিভলভার ধরা হাতটা ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোল-এর ওপর একটা কাউন্টারের গায়ে ঠেকে রয়েছে।

'ওটাকে থামাবার আর কোনো উপায় আছে?' প্রবল বাতাস আর বৃষ্টির মধ্যে প্রশ্ন করলো রানা। 'রিলোড, রিলোড, সুযোগ হারিয়ো না।'

রিভলভারের সিলিণ্ডার থেকে খালি কার্ট্রিজগুলো সরিয়ে নতুন রাউণ্ড ভরলো চন্দন, ব্যস্ত আঙুলগুলো কাঁপছে। বোটের বো ইয়টের যেখানে আঘাত করবে ঠিক সেখানেই তাকিয়ে আছে রানা। কালো ইয়ট ঘুরে গেলে কিছু করার নেই, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে রানা। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সংঘর্ষের ফলে ওটার রাডার নিশ্চয়ই জ্যাম হয়ে গেছে। অ্যারোনাফিসকে থামাবার জন্যে শল্য চিকিৎসকসুলভ সূক্ষ্মতার পরিচয় দেয়ার সুযোগ থাকলে খুশি হতো রানা। সরাসরি ধাক্কা মারলে ইয়টটা প্রায় অকেজো হয়ে যাবে। কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। ও শুধু আশা আর প্রার্থনা করতে পারে, কয়েক টন ইস্পাত সবেগে ভেতরে ঢোকার সময় পথে যেন মিলি বা প্যাসিমভ না পড়েন।

আকাশ থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে সূর্য। সাগরে যেন সন্ধ্যা নামছে। বাতাসের গতিবেগ বেড়েছে আরো। বৃষ্টি হচ্ছে ঝম ঝম করে।

আরো কার্তুজ থাকলে ভালো হতো, ভাবলো রানা। ম্যাগাজিনে যে ক'টা আছে, ওগুলোই শেষ সম্বল। সংঘর্ষের কথা ভেবে একটা ঢোক গিললো ও। অনুভব করলো, জিভটা শুকিয়ে গেছে।

'সাবধান, চন্দন!' গর্জে উঠলো রানা, যদিও তার কোনো

দরকার ছিলো না। এরইমধ্যে পায়ের পাতার ওপর বসে পড়েছে চন্দন, পিঠ সেঁটে আছে ফ্রন্ট প্যানেলের গায়ে। হুইলে আর কিছু করার নেই রানার, কাজেই চন্দনের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করলো ও, থ্রটলটা সম্পূর্ণ খোলা রেখে গেল।

প্রতিটি সেকেণ্ড যেন এক ঘন্টা সময় নিচ্ছে পেরুতে। হাতে অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা।

সাগর ফুঁসছে, ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ডেকের ওপর। ডেকের সচল পানি স্বচ্ছ কাঁচের মতো নেমে যাচ্ছে কিনারা দিয়ে।

সংঘর্ষের পর সময় যেন থমকে দাঁড়ালো। চোখের পলকে উল্টে পড়ার উপক্রম করলো কালো ইয়ট। টিমবার গুঙিয়ে উঠলো, কামানের গোলার মতো শব্দ করে ভেঙে গেল বীম। এইচআরসি-র বোট প্রতিপক্ষের বো-টাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সাইড ডেকের ভেতর দিয়ে হুইলহাউসের দিকে। ধাতব, কর্কশ আওয়াজ সহ্য করার মতো নয়। কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের বিরতিহীন সংঘর্ষ চললো।

নিস্তব্ধতা নামলো হঠাৎ।

বাতাসের ছোবল খেয়ে আলোড়িত হচ্ছে সাগর, লাফ দিচ্ছে, ফোঁস ফোঁস করছে ঢেউগুলো।

কথা বলার দরকার করে না, উঁচু হয়ে ওঠা ফোরডেক ধরে ছুটলো রানা, পিছনে চন্দন। লাফ দিয়ে কালো ইয়টে চলে এলো ওরা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা দানবের মতো কাত হয়ে আছে ওটা, মারাত্মক আহত, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।

রানা ডান দিকে ছুটলো, চন্দন বাঁ দিকে।

রানার অনুভূতিতে প্রথমেই তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার আঘাত

করলো। সেই সাথে নাকে ঢুকলো ডিজেল ফুয়েলের ভারি গন্ধ, বিদীর্ণ ফুয়েল ট্যাংক থেকে বেরিয়ে আসছে।

অ্যারোনাফিসের এক লোক ছুটে বেরিয়ে এলো দৃষ্টিপথে, হাতের পিস্তল ঊরুর পাশে, দেখামাত্র গুলি করলো রানা। চোখ নামিয়ে বগলের নিচে তাকালো লোকটা, পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙে বেরিয়ে গেছে বুলেট। শার্টটা লাল হয়ে উঠছে দেখে হাতের পিস্তল ফেলে দিয়ে বসে পড়লো সে, তারপর নেতিয়ে পড়লো। ভয়েই জ্ঞান হারিয়েছে।

একটা বিধ্বস্ত দরজা টপকে হুইলহাউসে ঢুকলো রানা। ভেতরের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে এটাকে আর হুইলহাউস বলা যায় না। আর্তচিৎকারটা এখান থেকেই হয়েছিল, সম্ভবত মিলির। কিন্তু না, তা নয়। চিৎকারটা অ্যারোনাফিস করেছে–হুইলের সাথে ঝুলছে সে, রঙিন চশমাটা লটকে আছে একটা কানের সাথে, মাথার চুল ডেক ছুঁই ছুঁই করছে।

'হেলপ মি!' এখনো বেসুরো গলায় চিৎকার করছে সে।

ক্ষীণ একটা বাঁকা রেখা ফুটলো শুধু রানার ঠোঁটে। অ্যারোনাফিসের একটা পা, হাঁটুর নিচেটা, একগাদা দোমড়ানো-মোচড়ানো ইস্পাতের মধ্যে আটকে গেছে। ট্রাউজারের পায়া বলতে কিছু নেই, হাঁটু আর ঊরু ভিজে আছে তাজা রক্তে। বাঁকাচোরা ইস্পাতের সাথে মাংস আর চর্বি দেখতে পেলো রানা।

'প্যাসিমভ কোথায়? মিলি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমরা ডুবে যাচ্ছি!' ডেকের কাছ থেকে, উল্টো করা চোখ দুটো বিস্ফারিত, ককিয়ে উঠলো অ্যারোনাফিস। 'আমি মারা যাচ্ছি!'

ইয়টের পিছন দিকে তাকালো রানা, কেউ নেই সেদিকে। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে টলমল করছে ইয়ট। কাত হয়ে পড়লো একদিকে, তাড়াতাড়ি দেয়াল ধরে নিজেকে স্থির রাখলো রানা। ইস্পাতের ভোঁতা একটা রডের সাথে ঠুকে গেল অ্যারোনাফিসের মাথা। তার শরীরটা দুলছে, জাহাজ স্থির না হওয়া পর্যন্ত মাথাটার নিরাপত্তা বলে কিছু নেই।

'বের করো আমাকে!' আর্তনাদ করে উঠলো অ্যারোনাফিস, ইস্পাতের গভীর জঙ্গল থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে টানাটানি করছে পাটা, ফাঁদে পড়া পশুর মতো দু'হাতে ঘুসি মারলো ডেকের ওপর। 'পাটা ছাড়িয়ে দাও! জাহাজ ডুবে যাচ্ছে!'

'জানি,' শান্ত গলায় বললো রানা। 'আগে ওদেরকে বাঁচাতে হবে।'

ডেকের ছ'ইঞ্চির মধ্যে ঝুলে থাকা চোখ দুটো ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকালো অ্যারোনাফিস। 'আমার দাবি...।'

'দাবি নিয়ে দরবার করো ভাগ্যের কাছে, কোস্টাস।' রানা আর সময় নষ্ট করলো না, বিধ্বস্ত হুইলহাউস থেকে পথ করে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। পিছনে খিস্তি করছে অ্যারোনাফিস, লোনা পানির ঝাপটা এসে তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিলো।

বাইরে বেরুতেই আবার ঝাঁঝালো ডিজেল ফুয়েলের গন্ধ পেলো রানা। ইস্পাতের সাথে ঘষা খাচ্ছে ইস্পাত, আগুনের একটা ফুলকি দরকার শুধু, এক পলকে গোটা জাহাজ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

নিকোলাই প্যাসিমভকে খুঁজে পেতে হবে ওর। দেখতে হবে মিলি কোথায়। দু'জনেই হয়তো আহত হয়েছে, শব্দ করতে

পারছে না। নাকি ডুবে গেছে? মারা গেছে সংঘর্ষের ফলে?

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ালো রানা, আলোড়িত সাগরে যা দেখলো তাতে শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানের চামড়া কুঁকড়ে উঠলো ওর।

নেমিসিসকে চিনতে পারলো রানা পরিষ্কার।

দশ

জাহাজটা এখনো দুই কি তিন মাইল দূরে।

ঢেউয়ের মাথা থেকে ছিটকে বেরোনো ফেনা আর বৃষ্টির ভেতর ভালোভাবে দৃষ্টি চলে না, তবে কাঠামোটা দেখামাত্র নেমিসিসকে চিনতে পেরেছে রানা। পরিষ্কার বোঝা গেল, বিধ্বস্ত কালো ইয়টটার দিকে আসছে ওটা, বো-র নিচে বিচূর্ণ ঢেউয়ের উজ্জ্বলতা।

একটা হ্যাচ লক্ষ্য করে ছুটলো রানা, কাঠের মই বেয়ে নামতে গিয়ে ইয়টের সাথে কাত হলো এদিক ওদিক। নিচে একটা স্টোরেজ হোল্ড, ভাঙাচোরা কাঠের বাক্সে ঠাসা, প্রতিটি বাক্সে ১৫৫ এম এম আর্টিলারি রাউণ্ড। অ্যারোনাফিসের বেসমেন্ট ওয়্যারহাউসে কি ঘটেছিল, পরিষ্কার হয়ে গেল। লোকটা তার

অস্ত্রশস্ত্র ইয়টে তুলে নেয়। একটা স্টেটরুমের ভেতর দিয়ে পথ করে নিলো রানা। এখানে আরো বাক্স রয়েছে। এগুলোয় বাজুকা রকেট আর গ্রেনেড দেখলো ও। ইয়ট তো নয়, ভাসমান একটা অস্ত্রভাণ্ডার।

ফুয়েল অয়েল-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

জরুরী তাগিদ অনুভব করে বাক্সগুলোকে কখনো পাশ কাটিয়ে, কখনো টপকে দ্রুত এগোলো রানা। অনেকক্ষণ হলো একই দিকে কাত হয়ে রয়েছে ইয়ট, খোলে একের পর এক আঘাত করে চলেছে ঢেউগুলো। স্টীল হোল্ডে পানি ঢোকার শব্দ পেলো ও। ওল্টানো একটা জাহাজে আগুন ধরে গেছে, দৃশ্যটা বারবার ফিরে এলো মনে।

সামনের দরজায় কলকল ছলছল করছে পানি, গোড়ালি ডুবে গেল রানার। দরজাটা খুলতে চেষ্টা করলো, ওর বুকের ওপর বিস্ফোরিত হলো সেটা, কবাট ধরে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলেও হাঁটু সমান পানির তোড় আঘাত করলো ওকে। কারা যেন চিৎকার করছে। একটু বেখেয়াল হতেই কবাট থেকে ছুটে গেল হাতটা, পানির তোড়ে ছিটকে পড়লো রানা, কয়েক সেকেণ্ড হাবুডুবু খেলো, গলায় পানি আটকে যাওয়ায় কাশলো। দুটো কামরায় একই লেভেলে পৌঁছুলো পানির স্তর, থেমে গেল প্রবাহ। পানি কেটে দরজার দিকে আবার এগোলো রানা, ইস্পাতের কর্কশ গোঙানি ঢুকলো কানে, আরেকটা শব্দকে মান্ধাতা আমলের বালব হর্নের মতো লাগলো, নিরেট ও বিপুল ইস্পাত পরস্পরকে পিষছে। আওয়াজগুলো ভেসে আসছে পাশের কমপার্টমেন্ট থেকে। ভেতরে ঢোকার আগেই বিচ্ছিন্ন, ছেঁড়া-ফাড়া, জট পাকানো এইচআরসি বোটের বো-টা দেখতে পেলো রানা। স্টেটরুমের

অর্ধেকটা বেদখল হয়ে গেছে। জোড়া বিছানা সহ একটা খাট সামনের দেয়াল ভেঙে অর্ধেকের বেশি ভেতরে ঢুকে গেছে, কমলা রঙের বালিশগুলো আলোড়িত পানিতে ভাসছে। ক্রমশ উঁচু হচ্ছে পানির স্তর। দ্বিতীয় কোনো পথ দিয়ে বেরুবার উপায় নেই রানার।

কেঁপে উঠলো কালো ইয়ট, তারপর আরো খানিকটা কাত হলো।

বিস্ফোরণের শব্দে খোলের গায়ে আঘাত করছে ঢেউ।

কাত হওয়া ডেকে এখন কোমর সমান পানি। হাত দিয়ে এটা-সেটা ধরে ফিরে আসছে রানা। মইটা পেয়ে উঠে এলো ওয়েদার ডেকে। তুমুল বৃষ্টি আর লোনা পানির ছিটা ভিজিয়ে দিলো ওকে, জ্বালা করে উঠলো চোখ। জাহাজের ওয়েদারসাইডে তাকিয়ে বুঝতে পারলো না কোথায় কয়লা-কালো আকাশের শুরু আর ধূসর সাগরের সমাপ্তি। অনেক কষ্টে, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে উঁকি দিলো বিধ্বস্ত হুইলহাউসের দিকে। বীভৎস দৃশ্যটার ওপর এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো রানার দৃষ্টি। একটা ভাঙা স্কাইলাইট থেকে নিচে তাকিয়ে আছে ও। এখনো ডেক ছুঁয়ে রয়েছে অ্যারোনাফিসের চুল, এক লোক আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে বড় একটা ছোরা দিয়ে ঘষে ঘষে তার পা কাটছে, হাঁটুর ঠিক নিচ থেকে। লোকটার হাত দুটো লাল হয়ে আছে।

এ-ব্যাপারে কিছু করার চিন্তা মনে ঠাঁই দিলো না রানা।

আর বেশি সময় নেই হাতে।

একদিকের রেইল ডুবে গেছে সাগরে।

লক করা ইয়ট উঠছে আর নামছে, যদিও নিয়মিত কোনো ছন্দে নয়। এইচআরসি-র বোট কালো ইয়টের ভেতর সেঁধিয়ে থাকা একটা ছোরা যেন, আহত শরীরের ভেতর মোচড় খাচ্ছে।

তৈজস-পত্র চুরমার হবার শব্দ হলো, ফার্নিচার ভাঙছে, আরেক দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে ভারি কার্গো।

এক মাইলের মধ্যে চলে এসেছে নেমিসিস। বৃষ্টি কমে গেলেও, ফেনা আর পানির ছিটায় দৃষ্টিপথ এখনো ঝাপসা।

আরেকটা হ্যাচ দেখতে পেয়ে নিচে নামলো রানা, জানে, জীবনে আর বেরুতে না পারার ঝুঁকি নিচ্ছে ও। আবর্জনা ভর্তি মেইন সেলুনে নেমেছে। এমনকি এখানেও অ্যামুনিশন ভরা বাক্স দেখা গেল। পিছনে গুলির শব্দ হতে ঝট করে এক পাশে সরে গেল ও, চরকির মতো আধপাক ঘুরলো, হাতের ম্যাকারভ গুলি করার জন্যে তৈরি। এক পলকে দৃশ্যটা দেখা হয়ে গেল রানার—চন্দনের পিঠ, তার সামনে সাদা শার্ট পরা দু'জন ক্রু, সেলুনের পিছন দিকের দরজা থেকে গুলি করছে। একটা বুলেট রানার কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। জবাবে ঝাঁকি খেলো চন্দনের হাত, ·৩৫৭ গর্জে উঠলো। পরমুহূর্তে সবেগে ঘুরলো চন্দন, তার হাতের রিভলভার ছিটকে গেল ইয়টের বাইরে, প্রতিপক্ষদের লক্ষ্য করে পর পর তিনটে গুলি করলো রানা। তাদের মধ্যে একজন কুঁজো অবস্থা থেকে স্তূপ-এর আকৃতি নিলো। অপরজনের পা হড়কালো, পিছলে পাশ কাটালো চিমনিটাকে, তারপর ঝাঁপ দিলো বিক্ষুব্ধ সাগরে, আকস্মিক আতংকে নিশ্চিত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

চন্দনের দিকে ঝুঁকলো রানা। একটা হাত ধরে বসে আছে সে, চোখমুখ কোঁচকানো। 'শুধু হাতে লেগেছে?' সমস্ত আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো রানার গলা।

'তেমন কিছু নয়,' বিড়বিড় করে বললো চন্দন। সমস্ত রক্ত

নেমে গেছে মুখ থেকে। তার লালচে গোঁফ খাড়া হয়ে রয়েছে, যেন রঙের দাগ ওগুলো।

'প্যাসিমভ আর মিলিকে কোথাও দেখেছো?'

'নিচে, পিছন দিকে, মাস্টার স্টেটরুমে,' কাতরকণ্ঠে বললো চন্দন। 'প্রায়-নিশ্চিত, মাসুদ ভাই। ক্রু দু'জন পাহারায় ছিলো। আমাকে দেখে ধাওয়া করে।'

ব্যস্ত হাতে চন্দনকে ধরলো রানা, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো, তার জ্যাকেটের কনুই থেকে রক্ত ঝরছে। 'আমাদের ইয়টে ফিরে যাও তুমি,' নির্দেশ দিলো রানা।

'মাসুদ ভাই, আমি…।'

'কথা নয়। যদি পারো ফরওয়ার্ড কমপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দেবে। যাও!'

চওড়া ধাপ বেয়ে নামার সময় পিছন ফিরে তাকালো না রানা, হোঁচট খেয়ে ঝপাৎ করে পড়লো, সিধে হলো কোমর সমান পানিতে। স্টেটরুমের দরজা বন্ধ, হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো। খুললো না। 'মিলি!'

দরজার ভেতর থেকে অস্পষ্ট গলা ভেসে এলো, মেয়েলি কণ্ঠ বলে চিনতে পারলো রানা, 'রানা? খোলো, প্লিজ, দরজাটা খোলো!'

দরজার গায়ে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা দিলো রানা। পাথরের মতো নিরেট ও অনড়।

ভেতর থেকে নিকোলাই প্যাসিমভের গলা ভেসে এলো, শান্ত ও ভারি। 'কোথাও একটা চাবি আছে। দেখুন খুঁজে পান কিনা।'

'চাবি আছে, পিছিয়ে যান আপনারা,' বললো রানা, পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেলো ইয়ট, ছিটকে দেয়ালের গায়ে পড়লো ও। সিধে হয়ে

তালার ওপর লক্ষ্যস্থির করলো, টেনে দিলো ট্রিগার। বিস্ফোরণের শব্দে তালা লেগে গেল কানে। বারুদের গন্ধ এলো, সাদাটে খানিকটা ধোঁয়া দেখা গেল পানির ওপর। কবাট থেকে বেরিয়ে এসে ডিগবাজি খেলো দরজার হাতল, পানিতে পড়ে তলিয়ে গেল। বিস্ফোরিত হলো কবাট, পানি কেটে বেরিয়ে এলো প্রথমে মিলি, বিস্ফারিত চোখ, মুখটা যেন আতংকের মুখোশ, শরীরের বাঁক আর ভাঁজগুলো ফুটে আছে ভিজে কাপড়ের নিচে। দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরলো সে।

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো রানা, হাতের অস্ত্রটা তাক করলো। 'ওপরে ওঠো, জলদি!' কঠিন সুরে নির্দেশ দিলো ও।

'রানা, তোমার দোহাই লাগে, ওরা যেন মি. প্যাসিমভকে ধরতে না পারে...।'

'কি বললাম তোমাকে? ওপরে চলে যাও!' রুশ বিজ্ঞানীর দিকে তাকালো রানা। 'আপনিও। আগে বাড়ুন, প্লিজ। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।'

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বারবার পিছন ফিরে রানার দিকে তাকালো মিলি, বার কয়েক হোঁচট খেলো ধাপের সাথে। 'মহৎ একজন মানুষকে আমি শুধু সাহায্য করতে চেয়েছি, রানা। প্রয়োজন হলে আবার করবো। এটা যদি কোনো অপরাধ হয়...।' ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

'এ নিয়ে পরে কথা হবে,' গর্জে উঠলো রানা। 'মুভ!'

দুটো ইয়টের জন্যেই হুমকি হয়ে উঠেছে সাগর, কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করছে না। বৃষ্টি থেমে গেলেও, তীব্র বাতাস এখন ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে ঝড়ে পরিণত হয়েছে। ঢেউগুলো যেন সাপের ফণা, অনবরত ছোবল মারছে জাহাজ দুটোকে। পোর্ট বোর দিক

থেকে ছুটে আসছে নেমিসিস, দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা, যেন একটা কালো পাঁচিল।

স্কাইলাইট দিয়ে পিচ্ছিল ডেকে বেরুতে হলো ওদেরকে, এই ডেকটাই সেলুনের ছাদ। বেরুতেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝড়। পড়ে গেল মিলি, পড়েই পিছলে গেল, পানির ওপর ঝুঁকে থাকা সুপার স্ট্রাকচারের দিকে ছুটলো শরীরটা। খপ করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন নিকোলাই প্যাসিমভ, তা না হলে দুর্ঘটনা ঠেকানো যেতো না। হাতের অস্ত্র নেড়ে ওদেরকে তাগাদা দিলো রানা। গা থেকে পানি ঝরছে ওর, একনাগাড়ে বিকট সব শব্দের ভেতর থাকায় কানে খুব কম শুনতে পাচ্ছে। চন্দনের কথা ভেবে মনে মনে উদ্বিগ্ন হলো ও। সে কি নিরাপদে পৌঁছুতে পেরেছে এইচআরসি বোটে? প্রতিটি পদক্ষেপে পিছলে যাবার ভয় রয়েছে, অনুভব করলো ও। ফুয়েল অয়েল-এর গন্ধ আগের মতোই ঝাঁঝালো।

বিধ্বস্ত হুইলহাউসের ছাদ হয়ে এগোলো ওরা। স্কাইলাইটের পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো রানা, প্রায় চমকে উঠলো। কোথায় অ্যারোনাফিস? গেল কোথায়?

অ্যারোনাফিস পালিয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্কশ একটা হাসির শব্দ বয়ে নিয়ে এলো বাতাস। আওয়াজটার মধ্যে উন্মত্ত একটা ভাব লক্ষ্য করে বুকের রক্ত পানি হয়ে গেল রানার। উৎসের দিকে ঘাড় ফেরালো ও। চোখে কাঁটার মতো বিঁধলো কোস্টাস অ্যারোনাফিস।

এইচআরসি ইয়টের বো-র ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, তার একজন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে। হাঁটুর নিচে কাটা পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে সে। রক্তে লাল হয়ে আছে সেটা। চোখে রঙিন

সানগ্লাসটা নেই। চোখ দুটো ছোটো হয়ে রয়েছে, দৃষ্টিটা অশুভ, জ্বলজ্বলে।

'তুমি আমার সর্বনাশ করেছো!' উন্মাদের মতো গর্জে উঠলো কোস্টাস অ্যারোনাফিস। 'আমি ধ্বংস হয়ে গেছি! কিন্তু তোমাকে আমি বাঁচতে দেবো না! তোমরা মারা যাবে, তোমরা সবাই!'

হাত তুলে তেলে ভেজা কিছু ছেঁড়া কম্বল দেখালো সে, উইণ্ডপ্রুফ সিগারেট লাইটার জ্বেলে শিখাটা ছোঁয়ালো কম্বলের গায়ে। কালো ইয়টের গর্তটা লক্ষ্য করে আগুনটা ছুঁড়ে দিলো সে, এইচআরসি জলযানের সামনের দিকে।

গুলি করলো রানা। কিন্তু এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

চোখ ঝলসানো আলো দেখা গেল, সেই সাথে গর্জে উঠলো আগুন।

এগারো

কালো ইয়টের ফাটল থেকে উথলে উঠলো আগুন, সাদা ইয়টের খোল বেয়ে ওপরে উঠলো, জ্বলে উঠলো পানিতে ছড়িয়ে পড়া তেল।

তীব্র আঁচ থেকে বাঁচার জন্যে হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটছে

রানা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার গুলি করলো। লোকগুলোর মুখ আর বুক ছিঁড়ে দিলো ওর বুলেট। কোটিপতির সহকারী ঢলে পড়লো ডেকের ওপর, অবলম্বন হারিয়ে তাল হারিয়ে ফেললো অ্যারোনাফিস। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো, রক্তভরা মুখের ভেতরটা দেখতে পেলো রানা, ঠোঁট ভাঁজ হয়ে আছে ভেতর দিকে। হাঁটুর কাছে বিচ্ছিন্ন পাটা ডেকে ফেলার চেষ্টা করছে সে, এক পায়ে ঘন ঘন লাফাচ্ছে। ভারসাম্য ফিরে না পাওয়ায় দাউ দাউ অগ্নিকুণ্ডের দিকে মাথা দিয়ে পড়ে গেল।

'আমাদের কি হবে?' কাত হয়ে থাকা ডেকে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে হুবহু একটা ব্যাঙের আকৃতি নিয়েছেন নিকোলাই প্যাসিমভ।

চট করে নেমিসিসের দিকে তাকালো রানা। প্রকাণ্ড দেখালো জাহাজটাকে। ঢেউয়ের মাথায় চড়ছে ওটা, চারপাশে গর্জন করছে উত্তাল সাগর। একটা মূক হতাশা গ্রাস করতে চাইলো রানাকে। কালো ইয়টের খোল জুড়ে সবগুলো বিধ্বস্ত পোর্টহোল জানালা থেকে আগুন তার লকলকে জিভ বের করে দিয়েছে। ধোঁয়া লেগে চোখ আর ফুসফুস জ্বালা করছে। আগুন ধরা ফাটলটা পেরিয়ে এইচআরসি ইয়টের বো-তে যাওয়ার কোনো পথ আছে বলে মনে হলো না। অথচ টিএনটি-র একটা পাহাড়ে বসে রয়েছে ওরা।

'এবার তুমি খুশিতো?' চিৎকার করলো মিলি, তার কালো চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। 'এখন আর মি. প্যাসিমভের বিনিময়ে নিজেকে বাঁচানোর কোনো সুযোগ নেই তোমার, অনেক দেরি করে ফেলেছো। কে.জি.বি. ওঁকে অনায়াসে তুলে নিয়ে যাবে।'

মিলির কথায় কান দিলো না রানা, সাদা ইয়টের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলো, 'চন্দন! চন-দ-ন!'

কেউ সাড়া দিলো না।

একটা ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, কাত হয়ে থাকা স্ত ূপটা মোচড় খেলো, পানিতে ডুব দিচ্ছে বো, প্রতিটি ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে লালচে শিখা।

যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে। একটা পিঁপড়েও বাঁচবে না।

মইটা হঠাৎ চোখে পড়লো রানার। খোলের গায়ে সাঁতারুদের জন্যে যেমন থাকে, এটাও সেরকম একটা। মইটা সেলুনের দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে। ঝট করে নিকোলাই প্যাসিমভের দিকে ফিরলো ও, অস্ত্রটার ভূমিকা গোপন করলো না। 'ওটা নিয়ে আসুন,' দ্রুতকণ্ঠে নির্দেশ দিলো ও, চোখ ইশারায় মইটা দেখিয়ে দিলো। 'পাশের ইয়টের ডেকের সাথে লাগান। তাড়াতাড়ি!'

রানার কথা মতো কাজ করলেন নিকোলাই প্যাসিমভ। ধাপগুলোর মাঝখানে আগুনের শিখা নাচানাচি করছে, তবে খুব বেশি উঁচু হচ্ছে না, দ্রুত পা ফেলে পার হওয়া সম্ভব। দূরত্বটা আট ফুটের বেশি হবে না।

মিলিকে টেনে নিয়ে এলো রানা, মইটার দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'যাও!'

যতোটা সম্ভব দ্রুত ছুটলো মিলি, দু'সারি দাঁত পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে হাত দুটো শরীরের দু'দিকে মেলে দিয়েছে, এক কি দু'বার বিপজ্জনকভাবে এদিক ওদিক কাত হলো, তার জুতোর সোল চাটছে শিখাগুলো। ওপর-নিচে দুলতে শুরু করলো মই, মিলির ভারে ডেবে গেল নিচের দিকে। তবে নিরাপদেই ওপারে পৌঁছুলো সে।

'এবার আপনি,' নিকোলাই প্যাসিমভকে বললো রানা।

মৃদু শব্দ করে সম্মতি প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক, সাবধানে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে মইয়ের ধাপে পা রাখলেন, তারপর দ্রুত ছুটলেন। কোনো রকম অঘটন না ঘটিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলো রানা। 'হুইলহাউসে,' নির্দেশ দিলো ও।

সশব্দে বাতাস টানলো মিলি, থমকে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়। তার পিছন থেকে উঁকি দিলো রানা। দেখলো, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে চন্দন।

জ্ঞান নেই চন্দনের, কারণটা সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। রানা শুধু আন্দাজ করতে পারলো, ওয়াটারটাইট ফরওয়ার্ড কমপার্টমেন্টের দরজাটা যখন বন্ধ করেছিল সে, নিশ্চয়ই ইয়টটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্বীপের দিকে রওনা হবার প্ল্যান ছিলো তার।

ওদের লীওয়ার্ড সাইড পেরিয়ে গেছে নেমিসিস, এই মুহূর্তে কালো ইয়টের দিকে ধীরগতিতে এগোচ্ছে, মাঝখানে খুব বেশি হলে একশো গজ দূরত্ব।

সাদা ইয়টকে পিছন দিকে চালিয়ে ফুল স্পীড দিলো রানা। থরথর করে কেঁপে উঠলো জাহাজটা, গোঙাচ্ছে। নিচের দিকে থ্রটল চেপে রাখলো রানা, ডান আর বাঁ দিকে বন বন করে ঘোরালো হুইলটা। ধীরে ধীরে, ঝাঁকি খেতে খেতে, বিরাট সাদা ইয়ট দোমড়ানো-মোচড়ানো ইস্পাত আর ভাঙা কাঠের স্তূপ থেকে ছিঁড়ে আনলো নিজেকে। ভার মুক্ত কালো ইয়ট সিধে হলো, ধীরে ধীরে নামছে সাগরে। পানির ওপর গড়াচ্ছে কালো আর হলুদ ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বাতাস পেয়ে কঠিন আর নিরেট টানেলের আকৃতি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

সবেগে হুইল ঘুরিয়ে ফুলস্পীডে রোডসের দিকে ছুটলো রানা, দোমড়ানো বো আঘাত করছে ঢেউগুলোকে, থরথর করে কাঁপছে ইয়ট।

পিছনে পড়ে থাকলো অ্যারোনাফিসের ইয়ট, সেটার দিকে এখনো এগোচ্ছে নেমিসিস। কোর্স দেখে মনে হলো, কালো ইয়টটার পাশে ভিড়তে চায় জাহাজটা।

হাতের অস্ত্র কাউন্টারের ওপর রেখে তীরে পৌঁছুনোর সংগ্রামে মন দিলো রানা। ইয়টের বো নিচু হয়ে আছে, এখুনি হয়তো কোনো বিপদ ঘটবে না, তবে পানি ঢুকছে বোটে। ছুটছে ইয়ট, তবে মাঝে মধ্যেই থামার উপক্রম করছে, এঞ্জিনের ইতস্তত ভাবটা ঘন ঘন দেখা দিলো। কে.জি.বি. এজেন্টরা নিশ্চয়ই অবস্থাটা লক্ষ করেছে, জানে ওদেরকে ধরার জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, যদি অ্যারোনাফিসের ইয়টে খুব বেশি সময় নষ্ট না করে। বোঝাই যাচ্ছে, তারা জানে না দুটো ইয়টের কোন্‌টায় আছেন নিকোলাই প্যাসিমভ। তবে জানতে খুব বেশি সময়ও লাগবে না।

'ফিরে চলো!' রানার পাশে চলে এলো মিলি, উন্মাদিনীর চেহারা। আবার চিৎকার করলো সে, 'এখনো সময় আছে, ফিরে চলো!'

'শাট আপ!' খেঁকিয়ে উঠলো রানা। 'সরো তুমি!'

হুইলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মিলি, ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো রানা। ডেকে বসে রাগে কাঁদতে শুরু করলো মেয়েটা। দূরের তীর লক্ষ্য করছে রানা। সৈকতের ভালো একটা জায়গা আগেই বেছে রাখা দরকার, বিশেষ করে ইয়টের মতিগতি যখন সুবিধের মনে হচ্ছে না।

সম্ভবত মিনিটখানেক পেরিয়েছে।

চোখের কোণে এখন আর মিলিকে দেখা যাচ্ছে না। তবে তার অনুপস্থিতি গুরুত্বের সাথে নিলো না রানা।

অকস্মাৎ একটা হাত সাঁৎ করে এগিয়ে এলো, কাউন্টার থেকে তুলে নিলো ম্যাকারভটা। 'এবার তোমাকে ফিরতে হবে, রানা। আমার কথা শুনতে বাধ্য তুমি। আমি দুঃখিত,' হিসহিস করে বললো মিলি।

উত্তেজনা আর ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে মিলির চোখ, রানার বুক লক্ষ্য করে ধরে আছে অস্ত্রটা। একটু একটু কাঁপছে হাতটা।

রানা কিছু বলার আগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো নিকোলাই প্যাসিমভের চেহারা। হাসলেন তিনি। 'ওটা আমাকে দাও, ডিয়ার,' তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বরে জরুরী তাগাদার ভাবটুকু চাপা থাকলো না।

'অবশ্যই, নিকোলাই।'

রুশ বিজ্ঞানীর হাসিখুশি শান্ত ভাব অকস্মাৎ কর্তৃত্বপূর্ণ, রাশভারী, আর নীরস হয়ে উঠলো। অস্ত্রটা হাতে চলে আসায় সম্পূর্ণ বদলে গেলেন তিনি। অত্যন্ত পেশাদারী ভঙ্গিতে রানার দিকে লক্ষ্যস্থির করলেন। হাতটা কাঁপছে না। তাঁর চোখে পলকও পড়ছে না। 'আপনি আমাকে এখুনি নেমিসিসে নিয়ে যাবেন,' রানাকে বললেন তিনি। 'আমি চাই না আপনি আমার নির্দেশ অমান্য করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনুন।'

ইয়টের কোর্স যা ছিলো তাই থাকলো, বদলালো না রানা। ওর ঠোঁটে এক চিলতে হাসি। 'তোমার মনে হয় না, মিলিকে সব কথা জানাবার সময় হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'কি বলতে চাও তুমি?'

'তুমি ভুয়া লোক, নিকোলাই প্যাসিমভের ডামি, তাই না?' বাস্তব সত্যের বিবরণ, শুধুই একটা প্রশ্ন নয়।

রাশিয়ানের ম্লান সবুজ চোখে ঘৃণা ফুটে উঠলো। 'এখন আর ব্যাপারটা গোপন রাখার কোনো কারণ দেখছি না আমি…।'

মিলির নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার শব্দে বাধা পেয়ে চুপ করে গেল লোকটা। 'নিকোলাই!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো মিলি 'এ-সব কি বলছো তুমি!'

লোকটা মিলির দিকে অস্ত্র তুলে নাড়লো। 'ওদিকে, রানার পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

'কিন্তু…!' বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল মিলি।

'মুভ!' গর্জে উঠলো লোকটা।

'এসো,' তিক্ত হাসি হেসে মিলিকে বললো রানা। 'পাশে জায়গা দিতে রাজি আছি আমি।'

ওদের দু'জনের দিকে অস্ত্র ধরলো লোকটা। 'অনুমতি পেলে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পারি,' বলে নিঃশব্দে, সকৌতুকে হাসলো সে, ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছে। 'আমি ক্যাপটেন মিখাইল বোগডানোভিচ, কে.জি.বি. অফিসার, অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

শুধু শুনলো রানা, চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না। শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইলো, 'তিনি তাহলে কোথায়, আসল নিকোলাই প্যাসিমভ?'

'কোথায় আবার, পরপারে। গতবছর মারা গেছেন তিনি, কিন্তু কাউকে তা জানতে দেয়া হয়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু। কয়েক বছর আগেই সরকারকে আমরা কে.জি.বি-র তরফ থেকে অনুরোধ করেছিলাম, নিকোলাই প্যাসিমভ মারা গেলে খবরটা যেন বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। তার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ না হয়ে পড়ার ওপরই নির্ভর করছিল আমাদের প্ল্যানটা…।'

‘আর সেটা হলো, তুমি তোমার বাকি জীবন তাঁর ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমে কাটাবে,’ বললো রানা।

‘ঠিক তাই। এবার, ইয়টটা ঘোরাও...।’

‘সত্যি আশা করো, এ-যাত্রা রক্ষা পাবে তুমি?’

‘তোমাকে আমি বোকা বানিয়েছি, বানাইনি?’ গর্বিত ভঙ্গিতে হাসলো বোগডানোভিচ।

‘কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেছো।’

‘তোমাকে গুলি করে নিজেকে আমার হুইল ধরতে হবে?’

কথা না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা।

পিছিয়ে গেল বোগডানোভিচ, পিস্তলটা তুললো, লক্ষ্যস্থির করলো রানার মাথায়।

‘না!’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো মিলি, আতংকে হাত দুটো বাল্কহেডের ওপর মেলে দিয়েছে সে। ‘রানা! যা বলছে শোনো!’

‘শোনা না শোনায় আসলে কিছু আসে যায় না, মিলি,’ বললো রানা। ‘যাই ঘটুক না কেন, দু’জনকেই খুন করবে ও। অনেক বেশি জানি আমরা।’

‘কে.জি. বি-র যে অফিসাররা এই অ্যাসাইনমেন্ট রচনা করেন, তুমি তাঁদের চক্ষুশূল, রানা,’ বললো বোগডানোভিচ। ‘সেজন্যেই তোমার বিরুদ্ধে সোচ্চার একটা গ্রুপকে অ্যাসাইনমেন্টটা দেয়া হয়। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিলো, প্রতিপক্ষদের মধ্যে যদি মাসুদ রানা থাকে, সুযোগ পেলে অবশ্যই তাকে খতম করতে হবে। আমরা সবাই গুস্তাফ তাতাভস্কির শিষ্য, রানা। তুমি শুধু তার পুরুষত্ব কেড়ে নিয়েই সন্তুষ্ট হওনি, শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের হাতে খুনও করেছো। কাজেই প্রতিশোধ নেয়ার এখনই সময়। বিদায়, রানা।’ হাসি হাসি চোখ-মুখ নিয়ে ম্যাকারভের ট্রিগার টানলো সে।

হ্যামার পড়লো খালি চেম্বারে।

রানা হাসলো না, গম্ভীর হয়ে আছে। 'তোমার বোঝা উচিত ছিলো, লোড করা একটা অস্ত্র এভাবে আমি ফেলে রাখতে পারি না।'

'ইউ বাস্টার্ড!'

'তবে, তাড়াতাড়ি তথ্য আদায়ে সাহায্য করেছে অস্ত্রটা। তুমি সরে থাকো, মিলি।' হুইল ছেড়ে দিয়ে ঘুরলো রানা, সামনের দিকে ঝুঁকলো, বোগডানোভিচকে খালি হাতে কাবু করবে। অস্ত্রটা ছুঁড়ে মারার প্রস্তুতি নিলো বোগডানোভিচ, মাথার পাশে উঁচু করে ধরলো, চোখ দুটো কুঁচকে ছোটো হয়ে আছে, দাঁতের সাথে সেঁটে আছে পুরু ঠোঁট।

অকস্মাৎ হলুদ-সাদা চোখ-ধাঁধানো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো হুইলহাউস, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। শকওয়েভের ধাক্কায় কাত হয়ে পড়লো ইয়ট। সবাই ছিটকে পড়ে একটা স্তূপ তৈরি করলো। ম্যাকারভের ব্যারেল রানার খুলিতে সশব্দে আঘাত করলো, একই সাথে ওর একটা হাঁটু সবেগে গুঁতো মারলো বোগডানোভিচের তলপেটের নিচে। হিস হিস করে ফুসফুস খালি করলো কে.জি.বি. এজেন্ট, গোঙাতে গোঙাতে হাতের ম্যাকারভ আবার তুললো। হাতটা খপ করে ধরে ফেললো রানা, অনুভব করলো খুলির ক্ষতটা থেকে রক্তের একটা গরম ধারা নেমে আসছে জুলফি বেয়ে। বোগডানোভিচের হাতটা বাল্কহেডের গায়ে সজোরে ঠুকে দিলো ও, আঙুলের গিঁটগুলো ভেঙে গেল।

সোজা হলো ইয়ট। আঁচড়ে খামচে স্তূপের তলা থেকে বেরিয়ে

এলো মিলি। কি যেন বিধ্বস্ত হলো আফটারডেকে। রানার ডান হাতের ঘুসি ডেকের ওপর শুইয়ে দিলো বোগডানোভিচকে। পঞ্চান্ন বছর বয়সে কতো সহ্য হয়, জ্ঞান হারিয়েছে সে।

'রানা, আমি দুঃখিত... ,' শুরু করলো মিলি।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে জুলফির রক্ত মুছলো রানা। দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠলো মিলি। 'দেখো,' বলে একটা হাত তুললো রানা।

ওদের পিছনে কালো ইয়টটার কোনো অস্তিত্ব নেই। তার জায়গায় রয়েছে কালো ধোঁয়ার বিশাল মেঘ। মেঘের ভেতর থেকে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে জঞ্জাল, আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে আগুনের গোলা। কালো ধোঁয়ার ভেতর অর্ধেকটা ঢুকে গেছে নেমিসিস। এরইমধ্যে আগুন ধরে গেছে জাহাজটায়, কিছুটা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে। বিস্ফোরণের উৎসের দিকে প্রতি মুহূর্তে আরো কাত হয়ে পড়ছে ওটা। প্রতিটি বিস্ফোরণের আওয়াজ যেন আরো ঝুঁকে পড়ার জন্যে প্ররোচিত করছে জাহাজটাকে।

তীব্র বাতাসে কালো ধোঁয়া বেশিক্ষণ গাঢ় থাকলো না। একের পর এক ভেঙে গেল স্তম্ভগুলো। ভেতরে দৃষ্টি চলার পর দেখা গেল বিস্ফোরণের উৎস বলতে এখন আর কিছু নেই। নেই কালো ইয়টটাও। ওখানে শুধু টগবগ করে ফুটছে সাগর।

দ্রুত ডুবে যাচ্ছে নেমিসিস। ইতিমধ্যে জাহাজের মাঝখানেও আগুন ধরে গেছে।

সৈকতে ইয়ট ভিড়ালো ওরা, পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলো, নেমিসিসের পিছনটা আকাশে উঠে গেছে, ব্রোঞ্জের তৈরি প্রকাণ্ড প্রপেলার দুটো ধীরগতিতে ঘুরছে। তারপর তলিয়ে গেল পানিতে।

বারো

'আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো,' বললো কর্নেল রুস্তমভ।

'হলো,' বললো রানা।

সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারের ইয়ট নিয়ে ওদের তীরে ভেড়ার পর একটা রাত পেরিয়ে গেছে। প্রথম যোগাযোগ করা হয় রানার তরফ থেকে, উদ্দেশ্য: গোটা ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া। কর্নেল রুস্তমভ সাড়া দিলো, আভাস দিয়ে জানালো, মস্কো থেকে ওকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রানার সাথে যোগাযোগ করার। রানা যোগাযোগ না করলে সে-ই যোগাযোগ করতো। এরপর ঘটনার বিবরণ আদান প্রদান করা হলো, সাথে মতামত। তারপর এলো প্রস্তাব। রানা বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার আর রুস্তমভ কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারের সাথে পরামর্শ করলো। সবশেষে দেখা-সাক্ষাতের আয়োজন করা হলো। রোডসের ছোট্ট একটা কাফেতে বসেছে ওরা।

'নিকোলাই প্যাসিমভ কোথায়?' জানতে চাইলো রুস্তমভ।

'ক্যাপটেন বোগডানোভিচ, বলতে চাইছো।'

'তুমি আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছো, বন্ধু।'

‘তাহলে ছল-চাতুরি বাদ দাও,’ বললো রানা, ওর বলার সুরে কোনো রকম সৌজন্য নেই। ‘মিখাইল বোগডানোভিচ তার পরিচয় স্বীকার করেছে। একজন সাক্ষীও আছে।’

‘হতভম্ব, দিশেহারা এক লোককে ফাঁদে ফেলেছো তুমি। সে কি বলেছে, গুরুত্ব দিয়ো না। ঘাবড়ে গিয়ে মানুষ প্রলাপ বকে না? কেন তোমার মনে হলো, উনি নিকোলাই প্যাসিমভ নন?’

একটা সিগারেট ধরালো রানা। শান্তস্বরে বললো, ‘প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করছিল সে। কে.জি.বি-র হাতে তাকে তুলে দেয়া হোক, তার এই দাবির মধ্যে ভাঁওতাবাজির সুর ছিলো। তোমাদের কাছে নিকোলাই প্যাসিমভ জঘন্য এক লোক, কারণ তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, কিন্তু নেমিসিসে তাকে আমরা দেখলাম ফার্স্ট-ক্লাস কেবিনে। এমন কি দরজাতে তালাও ছিলো না। তবে এ-সবের তেমন গুরুত্ব দিইনি আমি...।’

গভীর মনোযোগ দিয়ে রানার কথা শুনছে কর্নেল রুস্তমভ, ভোদকা ভরা গ্লাসটার গায়ে হাত বুলাচ্ছে সে, গ্লাসটা যেন তার পোষ মানা আদরের বিড়ালছানা।

রানা বলে চলেছে, ‘আমাকে সন্দিহান করে তোলে দুটো ঘটনা।’

‘কি কি?’ যেন হিসেব চাইছে কর্নেল, নোট করে নিচ্ছে মনের খাতায়।

‘গ্রীনের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার। এডওয়ার্ড গ্রীন, এইচআরসি-র তরফ থেকে তথাকথিক নিকোলাই প্যাসিমভের রাখাল। তুমি জানো কিনা জানি না, লোকটা সি.আই.এ-র এজেন্ট ছিলো। সরাসরি একমাত্র এভাবেই সি.আই-এর ভেতরে নাক গলায়।’

'আমি তোমার কাছে ইতিহাস শুনতে চাইনি।'

'নেমিসিসের কার্গো যখন ট্র্যান্সফার করলো অ্যারোনাফিস,' বলে চলেছে রানা, কর্নেলের কথা যেন শুনতে পায়নি, 'গ্রীনকে তখন ছুরি মারা হয়। এটা ধরে নেয়া অযৌক্তিক নয় যে গ্রীন বুঝতে পেরেছিল নেমিসিস কোর্স ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছে। কার্গো খালাসের সময় জাহাজ থেকে পালাবার সুযোগটা নিলো সে, উদ্দেশ্য সি.আই.এ. এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করে সাহায্য চাওয়া।

'কিন্তু মিখাইল বোগডানোভিচ তা হতে দেবে কেন? গ্রীনকে বাধা দিলো সে, অর্থাৎ ছুরি মারলো। গ্রীনের ভাগ্যে এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতোই, আগে বা পরে।

'দ্বিতীয় ঘটনার সাথে তুমি জড়িত। বোঝাই যায়, অ্যারোনাফিসের সাথে তোমার একটা চুক্তি হয়। ঠিক হয়, প্যাসিমভকে নেমিসিসে ডেলিভারি দেবে অ্যারোনাফিস–গতকাল। নেমিসিসে তাকে পাওয়া অর্থাৎ নেমিসিসে তার উপস্থিতি তোমাদের জন্যে যেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটার কোনো অর্থ বোঝা যায় না, তিনি যদি সত্যি প্যাসিমভ হন।'

কিছু বললো না কর্নেল, তার নীল সাইবেরিয়ান চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হাসিখুশি রানাকে জরিপ করছে।

সাধারণ একটা কাঠের টেবিলে বসে আছে ওরা। কাফেতে আর শুধু একজন লোক রয়েছে, কুক। কিচেন আর কেবিনের মাঝখানে একটা দেয়াল, দেয়ালের গায়ে ছোট্ট গরাদহীন জানালা, জানালার ওদিকে রান্নায় ব্যস্ত সে। কাফের মালিক, তার স্ত্রী ও

ভাগ্নি, এই তিনজন মিলে ব্যবসাটা দেখাশোনা করে। ভাগ্নিটি সুন্দরী, পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে সে। কর্নেলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনজনই চলে গেছে তারা। একা শুধু কুক রয়ে গেছে, কারণ তাকে চুলোয় চড়ানো রান্নাবান্নার ওপর নজর রাখতে হবে। এ-সব কর্নেলের কাছ থেকে শুনেছে রানা।

ওদের দু'জনের সুটই প্রায় ভিজে বলা যায়, কালকের বৃষ্টি আজও থামেনি। হাতে সময় কম থাকায় ছাতা বা রেনকোট কেনার কথা ভাবেনি ওরা। দু'পক্ষই এই জায়গায় সাক্ষাতের আয়োজন করার জন্যে ন্যূনতম সময়টুকু পেয়েছে শুধু।

খুক খুক কেশে শুধু গলা পরিষ্কার করাই সার, ইতস্তত আর আড়ষ্ট ভাব দূর করা যাচ্ছে না।

কোনো পক্ষই খুশি নয়।

সি.আই.এ. নেপথ্যে ছিলো, সেখানে থেকেই কেটে পড়েছে তারা। পশ্চিমা জগৎ স্বনামধন্য রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই প্যাসিমভকে কোনোদিনই পাবে না, এ-কথা জানার পর চরম হতাশ হওয়ারই কথা তাদের। কে.জি.বি. এডওয়ার্ড গ্রীনের পরিচয় জানা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেনি, এতেই তারা খুশি।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কে.জি.বি-র। দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা। এক ঢিলে কয়েকটা পাখি মারতে গিয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছে শোচনীয়ভাবে। পেরেস্ত্রয়কার কল্যাণে ভিন্নমতাবলম্বীরা বিদেশে পাড়ি জমাবার জন্যে রীতিমতো একটা আন্দোলন শুরু করেছে। দেশ থেকে মেধা পাচার হয়ে যাবার ভয় থেকে কে.জি.বি-র কিছু অফিসারের মাথায় প্ল্যানটা আসে। যেভাবে

হোক আন্দোলনটাকে বানচাল করতে হবে। দেশ থেকে কারা যেতে চাইছে, একবার বেরিয়ে গেলে কি ভূমিকা নেয় তারা, এ-সব নিজেদের ইচ্ছে মতো জনসাধারণকে জানাবার প্ল্যান ছিলো তাদের, দেশের মানুষ যাতে আন্দোলনটার সাথে একাত্মবোধ না করে। কে.জি.বি-র একটা গ্রুপ প্ল্যানটা তৈরি করে, সরকারের ওপরমহলকে কিছু না জানিয়ে। তাদের মিশন সফল হলে কি ঘটতো বলা যায় না, কিন্তু ব্যর্থ হবার পর ব্যাখ্যা দেয়ার ও জবাবদিহি করার একটা কঠিন পরীক্ষা এখন সামনে। ঢাকা থেকে কিছু প্রশ্ন সহ অনুসন্ধান করার ফলে মস্কোর টনক নড়েছে, গোটা ব্যাপারটা জানাবার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কে.জি.বি-কে। রানার ধারণা, রিপোর্ট করার পর আরো কিছু নতুন নির্দেশ পেয়েছে কে.জি.বি., যতোটা সম্ভব ক্ষতি কমিয়ে আনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে তাদেরকে। বোধহয় সেজন্যেই রানার সাথে দেখা করতে উৎসাহ দেখিয়েছে কর্নেল রুস্তমভ। ঢাকা থেকেও সে-রকম ধারণা দেয়া হয়েছে রানাকে।

'দু'ঘন্টা, রানা,' গম গম করে উঠলো কর্নেলের কণ্ঠস্বর।

'জানি। গ্রীক সরকার তার বেশি সময় দিতে রাজি হয়নি আমাদের।'

মোটা, মাংসল হাতটা দ্রুত নাড়লো রুস্তমভ। 'দু'ঘন্টার মধ্যে দেশটা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, তা না হলে ঢুকতে হবে চোদ্দ শিঁকের ভেতর।'

কোনো মন্তব্য না করে কামরাটার চারদিকে আরেকবার তাকালো রানা, সবশেষে বাইরের চৌরাস্তার ওপর চোখ বুলালো। কাফে আর কাফের চারপাশে আধ মাইল জায়গা নিউট্রাল গ্রাউণ্ড বলে একমত হয়েছে দুই পক্ষ। সদলবলে না আসার সিদ্ধান্ত

অনুমোদন করা হয়। প্রাচীন পাথুরে বিল্ডিঙের একটা গথিক খিলানের নিচে কাফেটা। বিল্ডিঙটা গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের আর্চবিশপরা প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করতেন, তুর্কীরা বিজয়ী হবার আগে পর্যন্ত। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ইহুদী শহীদ সড়ক দেখা যাচ্ছে। উনিশশো তেতাল্লিশ সালে জার্মান সৈন্যরা এই রাস্তার ওপর দু'হাজার ইহুদিকে জড়ো করে, থার্ড রাইখের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর জন্যে। চৌরাস্তার মাঝখানে টালি দিয়ে ছাওয়া একটা ফোয়ারা রয়েছে, একজোড়া ব্রোঞ্জের তৈরি সিন্ধু-ঘোটকের মুখ থেকে বেরোচ্ছে পানির বিপুল ধারা। দৃশ্যটা ট্যুরিস্টদের খুব প্রিয়।

রুস্তমভ বললো, 'আমি একা এসেছি। সেই কথাই ছিলো। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?'

'না,' বললো রানা। প্রতিবাদ জানাতে গেল রুস্তমভ, বাধা দিলো রানা। 'তবু আমরা কাজ শুরু করতে পারি,' বললো ও।

পাবলিক ওয়াল-ফোনের দিকে এগোলো রানা। নীল বাক্সে খুচরো পয়সা ঢুকিয়ে ডায়াল করলো। ভুলেও রুস্তমভের দিকে পিছন ফিরলো না ও। 'চন্দন?' জিজ্ঞেস করলো। 'নিয়ে এসো ওকে।'

'আসছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো রুস্তমভ। রানার মুখে কি যেন খুঁজলো সে।

'কাছাকাছি আছে ওরা, এখুনি পৌঁছে যাবে,' বললো রানা।

ম্লান মুখে ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালো কর্নেল। 'তোমাকে আমি বললাম, প্যাসিমভ দেশে ফিরে যেতে চান। কথাটা যদি বিশ্বাস করতে, ব্যাপারটা এতো জটিল আর তিক্ত হয়ে উঠতো না, অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেতো। তুমি হয়তো বিশ্বাস করো

না, কিন্তু সত্যি কথা বলছি, তোমার সাথে লাগতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না...।'

'এখনো তুমি ভান করবে লোকটা প্যাসিমভ?'

'অফ কোর্স।'

'এমন গাড়ল তো দেখিনি,' রাগের সাথে বললো রানা। 'এতো করে বলছি, বোগডানোভিচ সব উগরে দিয়েছে! ওটা বাদ দিয়ে তুমি বরং এক জাহাজ ইয়েলোকেক-এর ব্যাখ্যা দাও।'

'হো হো? ব্যাখ্যা দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই আমার! তবু বলছি, তোমার কি বিশ্বাস হয়, ইউরেনিয়ামের মতো একটা পদার্থ অ্যারোনাফিসকে সাপ্লাই দেবো আমরা, সে যাতে একদল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনালের হাতে তুলে দেয় জিনিসটা?' চোখ সরু করে চেহারায় জ্ঞানতাপসের ভাব আনলো রুস্তমভ। 'আমাদের একটা প্রবাদে বলা হয়...'

'রেহাই দাও!' টেবিলে ফিরে এসে বসলো রানা। ঝুঁকে পড়লো রুস্তমভের দিকে। 'শুরু থেকেই জানতে তোমরা, অ্যারোনাফিস তোমাদের কাছ থেকে ইউরেনিয়াম কিনতে চাইছে লিমবেরিতে সাপ্লাই দেয়ার জন্যে, ইটালিতে নয়। শুধু তাই নয়, এ-ও তোমরা অনেক আগে থেকে জানতে যে এইচআরসি নিকোলাই প্যাসিমভকে রাশিয়া থেকে বের করে নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছে।'

'তোমার কমনসেন্স কি বলে? এ-ধরনের একটা কিছু ঘটতে দিতে পারি আমরা?' চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল। 'তাছাড়া, ইউরেনিয়াম বিক্রি বা দান করা নিষিদ্ধ রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। বলছো, কে.জি.বি-র কাছ থেকে

ইউরেনিয়াম কিনতে চেয়েছে অ্যারোনাফিস—কি বলছো নিজেই জানো না। কে.জি.বি. কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাকি? ইউরেনিয়াম কোথায় পাবো আমরা?' হঠাৎ হাসলো রুস্তমভ। 'আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, মিশরে তোমাকে যে ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া এখনো তুমি কাটিয়ে উঠতে পারোনি। মনে বিরূপ প্রভাব পড়লে অনেক সময় আজেবাজে কল্পনা...।'

'ইউরেনিয়াম যোগাড় করা কে.জি.বি-র জন্যে কঠিন কিছু নয়,' বললো রানা। 'পরিমাণটা যখন নেহাতই সামান্য। সে যাই হোক...অ্যারোনাফিস আর এইচআরসিকে থামাতে পারতে তোমরা, সে ইচ্ছে যদি তোমাদের থাকতো।'

'কি বলতে চাইছো?'

'তোমরা চাওনি লোকে বিশ্বাস করুক প্যাসিমভ রাশিয়ায় আছেন, তোমরা চেয়েছিলে সবাই জানুক আফ্রিকায় আছেন তিনি,' বললো রানা। 'ইউরেনিয়াম রাশিয়ায় ফেরত নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে, নেমিসিস কৃষ্ণ সাগরের পথ ধরতো, রোডসের নয়। ওখানে তোমরা নেমিসিসকে পাঠালে স্রেফ একজন লোককে তুলে নেয়ার জন্যে, এটা বিশ্বাস্য নয়—বিশেষ করে তাকে যখন প্লেনে করে রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো পানির মতো সহজ কাজ ছিলো। জাহাজটা আবার সুয়েজ ক্যানেলের দিকে এগোলো। তোমাদের প্ল্যানের মূল ব্যাপারই ছিলো, ভুয়া প্যাসিমভ অর্থাৎ বোগডানোভিচকে নেমিসিসে থাকতে হবে।'

রুস্তমভের চেহারা ক্যারিকেচার হয়ে উঠলো। 'দাঁড়াও হে, বুঝতে দাও কি বলতে চাইছো তুমি—আমরা চেয়েছি ইউরেনিয়াম আর প্যাসিমভকে নিয়ে লিমবেরিতে চলে যাক নেমিসিস? কি ব্যাপার, রানা, সত্যি তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'লোকটা বোগডানোভিচ, প্যাসিমভ নন। তবে বোগডানোভিচকে বাকি জীবন প্যাসিমভের ভূমিকায় অভিনয় করতে হতো।'

'হুম। ভারি গোলমেলে, কমরেড রানা।'

'আমার ধারণা, সবই তোমার কাছে পরিষ্কার।'

'তারপর কি?'

'লিমবেরির চারদিকে অন্যান্য রাষ্ট্র, অর্থাৎ শুধুই মাটি, তার কোনো উপকূল নেই, নেই বন্দর। তার মানে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো বন্দর থেকে লিমবেরিতে পাঠানো হতো ইউরেনিয়ামের চালানটা, বিশেষ করে ওই একটা দেশের সাথেই যখন লিমবেরির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। চালানটা বন্দর থেকে রওনা হওয়া মাত্র হুইসেলে ফুঁ দিতো কে.জি.বি.। অ্যাসাইনমেন্ট সফল হতে যাচ্ছে দেখে কে.জি.বি. সোভিয়েত সরকারকে সব কথা খুলে বলতো, পছন্দ করুক বা না করুক, কে.জি.বি. প্ল্যান অনুসারে নাচতে হতো প্রশাসনকে। মিথ্যে কথা বলে অর্থাৎ ইটালিয়ান ইণ্ডাস্ট্রির নামে ইউরেনিয়াম কিনেছে লিমবেরি, সোভিয়েত সরকার সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারতো যে জিনিসটা চুরি গেছে।'

'কিন্তু বোগ...প্যাসিমভ সম্পর্কে ব্যাখ্যাটা কি?'

'আগেই বলেছি, এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার প্ল্যান ছিলো তোমাদের,' বললো রানা। 'ভুয়া প্যাসিমভ সম্পর্কে তোমরা বলতে, তোমাদের অজ্ঞাতে লিমবেরিতে পালিয়েছে সে, উদ্দেশ্য হলো সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুর লিমবেরিকে পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে সাহায্য করা।'

জিভ আর টাকরা সহযোগে বিচিত্র শব্দ করলো রুস্তমভ।

'ফ্যান্টাসী আর বলে কাকে! তুমি আমার পুরনো দোস্ত, কিন্তু আগে কখনো এই অবস্থায় দেখিনি তোমাকে।' মাথার চুলে আঙুল চালালো সে, নিচু গলায় আবার বললো, 'তোমার আসলে সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট দরকার।'

'যা ঘটেছে, তার আর অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই,' শান্ত গলায় বললো রানা।

হেসে উঠলো রুস্তমভ। টেবিলের ওপর চাপড় মারলো সে, তারপর হাতটা টেনে নিলো নিজের দিকে, যেন বাজির জেতা টাকাগুলো কাছে আনছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কিন্তু কেন? এ-ধরনের পাগলামি কেন আমরা করতে যাবো?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'ভিন্নমতাবলম্বীদের আন্দোলন। সোভিয়েত সমাজে আন্দোলনটা একটা ক্ষতের সৃষ্টি করছে। তোমরা কে.জি.বি-র একটা বিদ্রোহী গ্রুপ, আন্দোলনটাকে ব্যর্থ করার একটা সুযোগ দেখতে পাও। যদি প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে ভিন্নমতাবলম্বীদের একজন নেতা আসলে সুযোগসন্ধানী উন্মাদ, তাহলে তোমরা দাবি করতে পারো বাকি সবাইও তাঁর চেয়ে আলাদা কিছু নয়। ঘটনাটাকে তোমরা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে। অথচ বেচারি নিকোলাই প্যাসিমভ আজ এগারো মাস হলো মারা গেছেন।'

'হোয়াট!' কর্নেলের চোখে অকৃত্রিম অবিশ্বাস।

'ঢাকার সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে, তুমি জানো না?'

'গল্প তোমরা ভালোই বানিয়েছো দেখছি!' জোর করে হাসলো কর্নেল।

'বোগডানোভিচ বাকি জীবন পশ্চিমা জগতে থেকে যেতো,

প্যাসিমভের ভূমিকায়,’ বললো রানা। ‘কে.জি.বি-র একজন যোগ্য এজেন্ট, পশ্চিমা জগৎকে প্রচুর মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করতো সে। কয়েক বছর বা কয়েক যুগ পর হয়তো, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলে, তোমাদের সাথে যোগাযোগ করতো। পশ্চিমা জগৎ কি করছে না করছে, তার মাধ্যমে সব তোমরা জানতে পারতে। একটা কথা স্বীকার করি,’ হাসলো রানা, ‘তোমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি করে দিয়েছি আমি।’

মাথা নিচু করে গ্লাসে ভোদকা ঢাললো কর্নেল। ‘কাহিনীটা সত্যি ইন্টারেস্টিং, সন্দেহ নেই,’ বললো সে। ‘তবে দুঃখজনক হলো, ধোপে টেকে না।’

‘তাই?’

‘ইউরেনিয়াম। লিমবেরিকে ও-জিনিস আমরা দিতে পারি না, কারণ ভালো করেই জানি যে তা ব্যবহার করা হবে আমাদের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠা গেরিলা সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে। না, কক্ষনো না!’ ঘন ঘন মাথা নাড়লো সে।

‘লিমবেরিকে তোমরা দিচ্ছিলে না আসলে,’ বললো রানা। ‘চালানটা লিমবেরিতে পৌঁছুনোর আগেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে তোমরা চাপ দিতে, হয় ওরা জিনিসটা নষ্ট করে ফেলতো, না হয় ফেরত পাঠাতো রাশিয়ায়। তোমাদের একটা উপকার করার সুযোগ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অবশ্যই হাতছাড়া করতো না।’

‘তবু যদি, ধরো, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাখ্যান করতো আমাদের অনুরোধ?’

‘তবু বলবো, আসলে কোনো ঝুঁকিই তোমরা নাওনি।’

‘কি?’ বিস্মিত হবার ভান করলো কর্নেল।

'ইউরেনিয়াম ছিলোই না, বা থাকলেও তার পরিমাণ নেহাতই সামান্য। কোনোমতেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণ বলা চলে না। ব্যারেলগুলো ভরা হয়েছিলো বালি দিয়ে। শুধু ওপর দিকে সামান্য ইউরেনিয়াম দেয়া হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দর কর্তৃপক্ষকে বোকা বানাবার জন্যে। বি.সি.আই. ডাইভাররা কাল নেমিসিসে নামছে, তখন আরো ভালো ভাবে প্রমাণ করা যাবে।'

'কিন্তু তুমি তা জানলে কিভাবে?' চমকে গেল রুস্তমভ।

'উপকূল থেকে খানিক দূরে একটা ব্যারেল দেখতে পাই আমি, অ্যারোনাফিসের ভিলার কাছাকাছি। ব্যারেলটায় বেশিরভাগই বালি ছিলো। প্রথমে ভেবেছিলাম, সাগরের তলা থেকে ব্যারেলে ঢুকেছে। কিন্তু পরে দেখি, সাগরের তলায় বালি বলতে কিছু নেই, শুধু কোরাল আর পাথর।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো কর্নেল।

দোরগোড়ায় উদয় হলো চন্দন আর সাযযাদ, ওদের মাঝখানে মিখাইল বোগডানোভিচ। দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, রানার নির্দেশের অপেক্ষায়।

'অ্যারোনাফিস লিমবেরির সাথে বেঈমানী না করলে,' কর্নেলকে বললো রানা, 'অর্থাৎ সে যদি ইউরেনিয়ামটা হাইজ্যাক না করতো, তোমাদের প্ল্যানটা সফল হতে পারতো। কিন্তু কি আর করবে, বিধি বাম!'

চন্দনের হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে, স্লিঙের সাথে ঝুলছে সেটা। বোগডানোভিচের আঙুলের গিঁটগুলোতেও ব্যাণ্ডেজ। কে.জি.বি. এজেন্টের চেহারা ঝুলে আছে, ভিজে জ্যাকেট থেকে পানি ঝরছে। চোখে অনিশ্চিত ভাব।

গরাদহীন জানালা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কুক।

চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে সিধে হলো কর্নেল রুস্তমভ, তার চোখ দুটো জ্বলছে। 'বুঝেছি!' গর্জে উঠলো সে। 'তাহলে এই আপনার কীর্তি, নিকোলাই প্যাসিমভ? বেঈমান, বেজন্মা!'

বিস্ময়ে চোখ পিট পিট করলো বোগডানোভিচ, তবে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ধরতে পারলো সে। 'ইয়েস, কমরেড,' বললো সে।

ঘরের ভেতর যেন বজ্রপাত হলো। বুলেটের ধাক্কায় বোগডানোভিচের ফুসফুস থেকে হুস করে বাতাস বেরিয়ে এলো। সাথে সাথে মারা গেছে সে, মেঝেতে পড়ার আগেই, হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে বুলেট। গুলির শব্দটা রানার ঘাড় যেন কাফের পিছন দিকে মুচড়ে দিলো, হাতটা পৌঁছে গেল নিজের পিস্তলে। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে চন্দন আর সাযযাদ, তবে সংবিৎ ফিরতেই যার যার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ালো তারাও।

'এক ইঞ্চি কেউ নড়লে, মারা যাবে সে!' চিৎকার করলো কুক।

তার দিকেই তাকিয়ে আছে রানা, লোকটার হাতের পিস্তল জানালার ফ্রেমে ঠেকে আছে।

নিজের জায়গায় স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল রুস্তমভ, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে বোগডানোভিচের দিকে। তারপর লাশটার দিকে পিছন ফিরলো সে, যেন কুকের নির্দেশ তার জন্যে প্রযোজ্য নয়।

লাশের দিকে রুস্তমভকে পিছন ফিরতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো রানা। 'কেন, রুস্তমভ?' জানতে চাইলো ও।

'নিকোলাই প্যাসিমভ বলে কারো যখন কোনো অস্তিত্বই নেই, আমার দেশ তাকে বহন করার খরচটা কেন দিতে যাবে?' রানার

দিকে না ফিরেই পাল্টা প্রশ্ন করে জবাব দিলো কর্নেল। 'যার অস্তিত্বই নেই, তার তো আর বিচার হতে পারে না।'

'তাহলে অস্তিত্ব নেই ক্যাপটেন মিখাইল বোগডানোভিচেরও?'

'কোনো কালেই ছিলো না।'

কে.জি.বি. এজেন্ট দু'জন পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কুকের ইউনিফর্ম পরা লোকটা কাভার দিলো কর্নেল রুস্তমভকে, রুস্তমভ বেরিয়ে যাবার পর পিছু হটে সে-ও বিদায় নিলো।

চোখে বিস্ময় আর প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকালো চন্দন আর সাযযাদ।

'একটা কথাও স্বীকার করেনি সে,' বললো রানা।

'কিছুই না?'

'মস্কোর কড়া নির্দেশ আছে তার ওপর,' বললো রানা।

সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা ঋণ শোধ করতে হবে রানাকে। অথচ সময় আছে আর মাত্র দেড় ঘন্টা।

পুরনো ইটালিয়ান এক ভিলার উঠনে দাঁড়িয়ে আছে ও, ভারি দরজায় টোকা দিলো।

বৃষ্টি থেমেছে বটে, তবে চারদিক থেকে ভেসে আসছে পানি নামার শব্দ। ঠাণ্ডা, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, বাতাসে ফুলের গন্ধ। আকাশ যেন রূপোর তৈরি ছাদ।

দরজা খুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো মিলি। চোখের পানিতে ভিজে আছে তার মুখ। দরজার ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, কারণ সবগুলো পর্দা ঝুলছে। 'কি চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

দপ করে জ্বলে উঠলো মিলির চোখ। 'কেন? কারণটা কি এই যে তোমার জানা নেই, খদ্দেরদের কাছ থেকে কতো নিই আমি?'

'কথাটা রাগের মাথায় বলেছিলাম, নাকি মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল, এখন আর ঠিক মনে করতে পারছি না,' বললো রানা। 'তবে সেজন্যে আমি ক্ষমা চাই।'

'চলে যাও তুমি!' মিলির চিৎকারে ব্যথা আর অভিমান মাথা কুটছে। দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু বাধা দিলো রানা। 'তুমি আমাকে নষ্টা মেয়ে বলেছো! বলেছো আমি নাকি শরীরটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছি!' চিৎকার জুড়ে দিলো সে, মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'বললাম তো, আমি দুঃখিত।'

স্থির চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো মিলি। পায়ে জুতো নেই, লো-কাট ড্রেস পরে আছে, ব্যাকলেস। তার দীর্ঘ কালো চুল কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে চলে এসেছে, ঝুলে আছে নাভির দু'পাশে।

'তুমি কাঁদছিলে,' বললো রানা, জিজ্ঞেস করলো, 'প্যাসিমভের জন্যে?'

'না। ওই ব্যাপারে কেন যেন...আমার কোনো অনুভূতি নেই।'

'আর অ্যারোনাফিস?'

'সে তো একটা দুঃস্বপ্ন ছিলো, শুধু বুঝতে দেরি হয়েছে আমার। অসম্ভব, তার জন্যে কারো শোক হতে পারে না।'

নরম আঙুল দিয়ে মিলির চিবুকটা উঁচু করলো রানা। 'তাহলে?'

'ভাবিনি তুমি আবার আমাকে দেখতে চাইবে। মনে হচ্ছিলো, তুমি একটা নির্দয় পাষাণ!' হঠাৎ সেই আগের স্বভাব ফিরে পেলো

মেয়েটা।

রানাকে দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করলো সে। ওর গলা ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো। 'রানা, আমাকে ক্ষমা করার সম্ভাবনা সত্যি আছে কি?'

'আমি একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করতে এসেছি,' মিলিকে ধরে রেখে বললো রানা।

মুখ তুললো মিলি, দুটো মুখ খুব কাছাকাছি, পরস্পরের নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছে ওরা। 'কি?' জানতে চাইলো মিলি।

উঠনের একধারে বাগান, সেদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলো রানা। 'জায়গাটা মন্দ নয়। অনেক ফুলও ফুটে আছে।' লিনডোসে দেয়া মিলির প্রতিশ্রুতি ভোলেনি ও।

রানাকে নিজের শরীরের সাথে পিষে ফেলতে চাইলো মেয়েটা। 'একটা প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম বটে, ডার্লিং রানা, কিন্তু তার আগে বলো, কেউ আমাদের ধাওয়া করছে না তো? আমাদের মাথার ওপর কুৎসিত মৃত্যু ঝুলে নেই তো?'

'আমার হাতে সময় আছে মাত্র দেড় ঘন্টা, তারপর আমাকে হয় প্লেন ধরতে হবে, নয়তো জেলে ঢুকতে হবে,' বললো রানা।

'তাই? এটাও কম বিপদ নয়,' বললো মিলি, গলার স্বর খসখসে। 'কারণ তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, মাসুদ রানা, নির্ঘাত তুমি প্লেন মিস করবে।' রানাকে ভেতরে টেনে নিলো সে, পায়ের ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করলো রানা।

মনে হলো ঝুঁকি নেয়াটা পোষাবে।

***

মাসুদ রানা-১৭৯

বিষকন্যা-২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

কায়রো থেকে ফিরেই আবার
বিপদে পড়লো রানা। আবার সেই কর্নেল রুস্তমভ।
অযাচিতভাবে রানাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো
বিদেশ-বিভুঁইয়ে কে এই বাঙালী যুবক?

অতিচালাক ডাচ জর্জ—পাওয়ার কথা গলায় দড়ি,
পেল বুলেট।
মিলিকে নিয়ে আরেকবার পালাবার চেষ্টা করলো রানা।
কিন্তু রহস্যময়ী যুবতী পালিয়ে গেল ফাঁকি দিয়ে।

খোলা সাগরে আক্রমণ করলো রানা ওদের ইয়ট।
এবং সবশেষে মুখোমুখি হলো রুস্তমভের।
তারপর?

বাইশ টাকা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০